গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৮ বর্ষ ৩২ সংখ্যা ২৪ - ৩০ মার্চ, ২০০৬ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রেই মিলোসেভিচের মৃত্যু

— নীহার মুখার্জী

পূর্বতন যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রনেতাদের বিচারের জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা তৈরি আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল যেভাবে পূর্বতন যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট বন্দী ও অসুস্থ স্লোবোদান মিলোসেভিচের উপযুক্ত চিকিৎসার আবেদন খারিজ করে দিয়ে তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিল, তাকে ধিক্কার জানিয়েছেন এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী। ১৮ মার্চ এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, স্লোবোদান মিলোসেভিচকে যুগোশ্লাভিয়ার বাইরে তুলে নিয়ে গিয়ে যেভাবে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, সেটাই ছিল সকল আন্তর্জাতিক আইন ও রীতিনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। প্রেসিডেন্ট মিলোসেভিচ যুগোশ্লাভিয়ার জনগণের বিরুদ্ধে কোনও অপরাধ যদি করেই থাকেন, তবে উচিত ছিল তাঁর বিচারের বিষয়টা যুগোশ্লাভিয়ার জনগণের উপরই ছেড়ে দেওয়া — এটাই ছিল সমগ্র বিশ্বের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের দৃঢ় অভিমত। কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যখন তাঁকে দেশের বাইরে নিয়ে গিয়ে বন্দী করা হল, তখনই সাম্রাজ্যবাদীদের প্রকৃত মতলব সম্পর্কে গভীর আশঙ্কা দেখা দেয়। এখন কারাগারের কুঠুরিতে মিলোসেভিচের আকস্মিক মৃত্যু এবং তাঁর প্রয়োজনীয় চিকিৎসা না পাওয়ার সংবাদ ওই আশঙ্কাকেই সত্য প্রমাণ করল।

ইরাকের উপর বর্বর মার্কিন বিমানহানাকে ধিক্কার জানাল এস ইউ সি আই

গত ১৬ মার্চ ইরাকের উপর বর্বর মার্কিন বোমাবর্ষণের তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ১৮ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন, ২০০৩ সালে ইরাকে মার্কিন আক্রমণের পর এটাই দখলদার সেনা কর্তৃক সবচেয়ে বড় বিমানহানা, যা নজিরবিহীন ধ্বংস ও হত্যা ঘটাচ্ছে। তিনি বলেন, ইরাকি জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ভাঙতে ব্যর্থ হয়েই হতাশার থেকে শেষ চেষ্টা হিসাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এই বিমানহানা চালিয়েছে। কিন্তু আমরা নিশ্চিত যে, এই পাশবিক নৃশংসতাও অচিরেই নিষ্ফল প্রমাণিত হবে এবং সার্বভৌম ইরাকের বুকে বসে থাকা বেআইনি দখলদাররা এমন প্রত্যাঘাতের মুখে পড়বে যে, তারা অতি দ্রুত ইরাক ছাড়তে বাধ্য হবে।

কমরেড মুখার্জী, বিশ্বের সকল শান্তিকামী জনগণকে সংগ্রামী দেশপ্রেমিক ইরাকি জনগণের পাশে দাঁড়াতে আহ্বান জানিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে মার্কিন যুদ্ধবাজদের হুঁশিয়ারি দিয়ে কমরেড মুখার্জী বলেছেন, বিভিন্ন মহল থেকে ব্যক্ত আশঙ্কা মতো আমেরিকা যদি ইরাকের মতোই ইরানের উপরও যেকোন অজুহাতে হানাদারি চালাবার ষড়যন্ত্র করে থাকে, তবে সেই আঘাত কিন্তু বুমেরাং হয়ে তার পক্ষে যাবে এবং বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও শান্তিকামী জনগণ সেই মার্কিন পরিকল্পনা অবশ্যই ব্যর্থ করে দেবে।

রাজনৈতিক প্রচারে নিষেধাজ্ঞা

গণতন্ত্রের ধাঁচার আড়ালে স্বৈরতন্ত্রের পদধ্বনি

পশ্চিমবঙ্গ সহ চার রাজ্যের নির্বাচনের ঠিক আগে দেওয়াললিখন ও পোস্টারিংয়ের উপর নির্বাচন কমিশনের নিষেধাজ্ঞা এবং তা কার্যকরী করার ব্যাপারে সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের অগ্রণী ভূমিকা দেশের নির্বাচন প্রক্রিয়াকে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছে। এই বিষয়টি সঠিকভাবে উপলব্ধি করা এবং তার ভিত্তিতে শোষিত মানুষের সচেতন ভূমিকা পালনের উপরেই বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় জনগণের উপর নামিয়ে আনা ক্রমবর্দ্ধমান অত্যাচারের বিরুদ্ধে আগামী দিনে গণআন্দোলনের ভবিষ্যৎ বহুলাংশে নির্ভর করছে।

একথা বোঝা দরকার যে, গণআন্দোলন এবং গণতান্ত্রিক নির্বাচনের উপর এই নিষেধাজ্ঞার ফলাফল সুদূরপ্রসারী। যদিও আপাতত বলা হচ্ছে, এই নিষেধাজ্ঞা কেবল নির্বাচনী প্রচারের ক্ষেত্রেই কার্যকর হবে, কিন্তু বাস্তবে যে শেষপর্যন্ত সর্বপ্রকার রাজনৈতিক প্রচারের উপরেই ধীরে ধীরে এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হবে তা বোঝা আদৌ কঠিন নয়।

এই নিষেধাজ্ঞা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় সম্প্রতিকালে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার পুলিশ-প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে বুর্জোয়া গণমাধ্যমের ক্রমাগত আন্দোলনবিরোধী প্রচার ও এ সম্পর্কে আদালতের কিছু রায়কে শিখণ্ডী খাড়া করে, পুঁজিবাদী শোষণ ও তার স্বার্থে গৃহীত জনবিরোধী সরকারি নীতির বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিবাদের সুযোগকে কীভাবে ক্রমাগত সঙ্কুচিত করার চেষ্টা করছে — তা সকলেই দেখতে পাচ্ছেন। কিছুদিন আগেই মিটিং-মিছিল বন্ধ করা, বন্‌ধ নিষিদ্ধ ঘোষণা করার চেষ্টা তারা করেছিল। এও লক্ষণীয় যে, একমাত্র অবস্থানগত পার্থক্য, অর্থাৎ সরকারি ক্ষমতায় থাকা অথবা বিরোধী ভূমিকায় থাকার ওপর যতটুকু পার্থক্য নির্ভর করে ততটুকু, ছাড়া এ ব্যাপারে কংগ্রেস, তৃণমূল, বিজেপি ও সিপিএম-এর মধ্যে নীতিগত মৌলিক কোনও পার্থক্য নেই। কিন্তু গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার সরকারি অপচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রবল জনমতের জন্য এগুলি

ছয়ের পাতায় দেখুন

কোচবিহারে টমেটো চাষীদের চরম দুর্দশা

বিগত কয়েক বছর যাবৎ হলদিবাড়ী ব্লকের ব্যাপক অংশ জুড়ে শুরু হয়েছে হাইব্রিড টমেটো চাষ। এই চাষে চাষীদের যুক্ত করার ফাঁদ পাততে একদিকে যেমন বহুজাতিক বীজ ও সার কোম্পানিগুলি আসরে নেমেছে তেমনই এর সাথে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক ব্যাঙ্ক। বর্তমান বছরে টাটা কোম্পানিও এখানে টমেটো চাষের দাদন নিয়ে হাজির হয়েছে। তারা এখানে গড়ে তুলছে নানা চটকদারি সংগঠন। যেমন ফার্মার্স ক্লাব, কৃষক বন্ধু সংগঠন ইত্যাদি। 'টমেটো লাগাও - রুপিয়া কামাও' স্লোগানে চাষীদের মাতিয়ে দিতে কোম্পানির এজেন্টদের মাস দুয়েক আগে গ্রামে দেখা গেলেও এখন আর তাদের পাত্তা নেই। এদিকে উৎপাদিত টন টন টমেটো বাজারে উঠছে কিন্তু খরিদ্দার নেই। নেই ব্যাঙ্ক, নেই টাটা, নেই কোন কৃষক বন্ধুর সংঘ বা দল।

প্রশাসন অচেতন, আগুনখোর কৃষিমন্ত্রী তাঁর তনয়ের ভোট বৈতরণী পার হওয়ার খোয়াবে মগ্ন। রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার এমন কুম্ভকর্ণ-ঘুমে আচ্ছন্ন যে হাজার দুন্দুভি পিটিয়েও সে ঘুম ভাঙে না। ফলে চাষীদের ফসল আজ হরির লুঠের বাতাসা। অভাবী চাষী পচনশীল মালের ঝুঁকি নিতে অপারগ হয়ে বহু অর্থ ব্যয়ে উৎপাদিত ফসল জলের দরে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। বস্তুত আজ টমেটোর দাম কমতে কমতে এক কেজি টমেটো বিক্রি হচ্ছে মাত্র ৩৭ পয়সায়। কখনও কখনও এর চেয়েও কম মূল্যে এখানে টমেটো বিক্রি হচ্ছে। জাতীয় কৃষিনীতির গোলক ধাঁধায় চাষীদের সর্বনাশ ব্যবসায়ীর পৌষমাস। ঋণগ্রস্ত চাষী যখন ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে তখন মুনাফালোভী মালিকের গড়ে উঠছে গগনচুম্বী অট্টালিকা।

টমেটো চাষীদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই হলদিবাড়ী/বেলতলী এবং দেওয়ানগঞ্জ লোকাল কমিটি চাষীদের সংগঠিত করে গণআন্দোলনের ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি একটি বৃহৎ মিছিল হলদিবাড়ী বাজার পরিক্রমা করে ব্লক অফিসে গণডেপুটেশন প্রদান করেন। এখানে একটি সভায় হলদিবাড়ী লোকাল কমিটির সম্পাদক রুহুল আমিন ভাষণ দেন। এস ইউ সি আইয়ের এই আন্দোলনে ব্লকের সর্বত্র দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে এবং আন্দোলনের চাপে টমেটোর দাম বাড়তে শুরু করেছে। নৈতিক আধারের উপর প্রতিষ্ঠিত এই ধরনের আন্দোলনই একমাত্র বধির সরকারের টনক নড়াতে পারে।

ইরাক আক্রমণের তৃতীয় বর্ষপূর্তিতে আমেরিকায় যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ

বিক্ষোভে সামিল হাওড়ার শ্রমিকরাও

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী হাওড়া জেলা কমিটির উদ্যোগে ২০ ফেব্রুয়ারি জেলাশাসক অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। বিক্ষোভে চার শতাধিক শ্রমিক অংশগ্রহণ করেন। এতে বন্ধ হওয়া কল-কারখানার শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। সরকারি ক্ষমতায় আসীন দলগুলি, প্রধানত সিপিএমের শ্রমিক সংগঠন সি আই টি ইউ'র নেতৃত্বে, মালিকদের সাথে যোগসাজসে কীভাবে শ্রমিক আন্দোলনের কোমর ভেঙে দিচ্ছে, এ সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য। কমরেড কালী সামন্ত-র নেতৃত্বে চারজনের প্রতিনিধি দল জেলা শাসককে স্মারকলিপি পেশ করে।

জেলার সমস্ত শ্রমিক-কর্মচারীর পরিচয়পত্র প্রদান, পি এফ, গ্রাচুইটি, ই এস আই, ন্যূনতম স্বাস্থ্যবিধি চালু করা, ন্যূনতম মজুরি, সমকাজে সমবেতন দেওয়া, বেআইনি ঠিকাদারি প্রথা বন্ধ করা, আট ঘণ্টার বেশি কাজ না করানো, মালিক-পুলিশ-গুণ্ডাদের আক্রমণ বন্ধ ইত্যাদি দাবিতে এই স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

কলকাতা

মদের দোকার খোলার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

রাণীকুঠী শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে একটি মদের দোকান খোলার বিরুদ্ধে গত ৯ মার্চ অল ইন্ডিয়া ডি ওয়াই ও কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে এই দোকানের সামনে একটি সভা করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সুপ্রিয় ভট্টাচার্য। সভায় রাজ্য সরকারের মদের লাইসেন্স নীতির সমালোচনা করা হয়। এলাকার বহু মানুষ সভাস্থলে জড়ো হয়ে আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানান। এরপর মিছিল করে রিজেন্ট পার্ক থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, এই স্থানের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সূর্যনগরে একটি মদের দোকান খোলাকে কেন্দ্র করে সংগঠনের নেতৃত্বে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে স্থানীয় নাগরিকদের সংগঠিত করে 'সূর্য সেন স্মৃতি রক্ষা কমিটি' গড়ে ওঠে। এই কমিটির উদ্যোগে মাসাধিক কাল ধরে অবস্থান বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে। পাশের অঞ্চলের এই আন্দোলনের প্রভাব রাণীকুঠীর মানুষদের মধ্যে আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি করেছে।

উত্তর ২৪ পরগণা

চটকল শ্রমিকদের ডেপুটি লেবার কমিশনারের দপ্তর ঘেরাও

অবিলম্বে বর্ধিত ডিএ এবং বকেয়া গ্র্যাচুইটি প্রদান ও এলায়েন্স জুটমিল খোলার দাবিতে পাঁচ শতাধিক চটকল শ্রমিক ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র নেতৃত্বে বারাকপুর ডেপুটি লেবার কমিশনারের দপ্তর ঘেরাও করে। শ্রমিকদের দুর্দশা ও প্রতিকারের আন্দোলন সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন নৈহাটি, এলায়েন্স, আগরপাড়া, কামারহাটি ও কাকিনাড়া জুটমিলের পক্ষে যথাক্রমে শ্রমিক নেতা কমরেডস্ আব্দুল জব্বার, রামজি সিং, রাজেশ চৌধুরী, নিমাই দাস, চঞ্চল কুর্মী প্রমুখ। এছাড়া বক্তব্য রাখেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক, বেঙ্গল জুটমিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সহসম্পাদক কমরেড অমল সেন এবং এস ইউ সি আই রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সদানন্দ বাগল। এ রাজ্যে মালিকরা শ্রম আইন লঙ্ঘন করলেও এবং পিএফ, গ্রাচুইটির টাকা আত্মসাৎ করলেও বামফ্রন্ট সরকারের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন সকল বক্তাই। প্রবীণ শ্রমিকনেতা কমরেড কমল ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ডেপুটি লেবার কমিশনার ও এস ডি ও'র কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

ম্যালেরিয়া হাসপাতালের দাবিতে

হাজরা মোড়ে নাগরিকদের অবস্থান

গত ২২ ফেব্রুয়ারি কলকাতার হাজরা মোড়ে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির রাসবিহারী-আলিপুর আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে এক নাগরিক অবস্থান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। ২৮২ নং কালীঘাট রোডে ৩০ শয্যা বিশিষ্ট একটি অত্যাধুনিক ম্যালেরিয়া হাসপাতাল চালু করার কথা ঘোষণা করেছিলেন পূর্বতন মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায়। কয়েক বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও হাসপাতালটি চালু করার কোন উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। দক্ষিণ কলকাতার বিস্তীর্ণ ম্যালেরিয়াপ্রবণ এলাকায় ম্যালেরিয়া হাসপাতাল চালু করার দাবি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও বর্তমান মেয়র হাসপাতাল না করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এর প্রতিবাদে এদিন ১২টা থেকে অবস্থান শুরু হয়। কালীঘাট ও সংলগ্ন এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ ম্যালেরিয়া হাসপাতালটি অবিলম্বে চালু করার দাবিতে বক্তব্য রাখেন। অবস্থানমঞ্চে উপস্থিত হয়ে আন্দোলনকে দাবি আদায় পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে সর্বপ্রকার সহযোগিতার অঙ্গীকার ও আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন অধ্যাপক কান্তীশ চন্দ্র মাইতি, কলকাতা পুরসভার ৮৫নং ওয়ার্ডের পৌরপিতা দেবাশিষ কুমার, ফোরাম ফর হিউম্যান লিগাল অ্যান্ড ইকোলজিক্যাল রাইটস্-এর সম্পাদক কুনাল গুহ, অ্যাডভোকেট প্রবীর চ্যাটার্জী ও কালীঘাট অঞ্চলের বিশিষ্ট সমাজসেবী রথীন্দ্রনাথ গুঁইন প্রমুখ। এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ আবৃত্তি ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন। আগামী দিনে বৃহত্তর কর্মসূচি নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন সভার সঞ্চালক সুভাষ জানা।

১৭ দফা দাবিতে মুর্শিদাবাদে শ্রমিকদের ডেপুটেশন

রাজ্যব্যাপী প্রতিবাদ সপ্তাহে মুর্শিদাবাদের শ্রমিক কর্মচারীরাও বিভিন্ন দাবিতে সোচ্চার হন। ১৭ ফেব্রুয়ারি রঘুনাথগঞ্জে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে এবং ২০ ফেব্রুয়ারি বহরমপুরে জেলা কালেক্টরেটের সামনে বিক্ষোভ অবস্থান হয়। বিক্ষোভে বিড়ি, স্বর্ণশিল্প, রিক্সাভ্যান, সি এইচ জি, টিডি, দুগ্ধব্যবসায়, বিদ্যুৎ প্রভৃতি ক্ষেত্রের শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। সবচেয়ে বঞ্চিত এবং অবহেলিত পরিচারিকারাও এই বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন। ১৭ দফা দাবিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিতে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মস্কোতে শীতের বলি ১১৬ জন

পুঁজিবাদী রাশিয়ায় ভেঙে পড়েছে তাপসঞ্চালন ব্যবস্থা

গত শীতে প্রবল ঠাণ্ডায় রাশিয়ার রাজধানী মস্কো শহরে মৃত্যু ঘটেছে ১১৬ জনের। এমন ঠাণ্ডা ত' কমবেশি প্রতিবছরই পড়ে, কিন্তু এমন ঘটনা কি নিয়মিত ঘটত? সোভিয়েত ইউনিয়নে ঠাণ্ডায় জমে মৃত্যুর ঘটনা ছিল বিরল এবং জনপদবিচ্ছিন্ন এলাকায় থাকা আকস্মিক অসুস্থতা কিম্বা এক আধজন মদ্যপকে ঠাণ্ডায় মৃত অবস্থায় পাওয়া যেত। কিন্তু ১১৬ জন! একটিমাত্র শহরে! একধাক্কায় এতগুলি শিকার, শীত এর আগে কখনও পায়নি। এদের বেশিরভাগই নিরাশ্রয় এবং মাতাল হলেও বাড়িতে রুম হিটার না থাকার কারণেও মারা পড়েছে। বাস্তবে দেশের সর্বত্রই তাপ সঞ্চালন ব্যবস্থাগুলি ভেঙে পড়েছে।

এসবই, পরিষেবা ও সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রগুলিতে ব্যাপক পরিবর্তনের অনিবার্য পরিণতি। সোভিয়েত শাসনে সাধারণত থাকাটা ছিল নিখরচায়। বাস্তবে নিরাশ্রয় বলে কেউই ছিল না। তাপ সঞ্চালন, জল, বিদ্যুৎ এসবের দাম ছিল নিতান্তই নামে মাত্র। মদ্যপদের জন্যও চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল — যারা আজ পরিত্যক্ত। এসবই পুঁজিবাদের নিষ্ঠুর ও সংহারক চেহারাটিকে উদ্‌ঘাটন করে। নব্বই-এর দশকে প্রথমেই সরকারি আবাসনব্যবস্থার ব্যাপক বেসরকারীকরণ শুরু হয়। আর্থিক অনটনের প্রবল চাপে অসংখ্য মানুষ তাদের বাড়িঘর ফ্ল্যাট বেচে দিতে বাধ্য হয়। সংশ্লিষ্ট মাফিয়াগোষ্ঠীর চাপও ছিল প্রবল। ঘর ভাড়া নেওয়ার টাকা যারা জোটাতে পারল না তারা রইল দরজার বাইরেই।

শীত গ্রাস করেছে ভিখারিদের। মেট্রো স্টেশনগুলিতে নিয়মিত চেকিং-এ তারা ধরা পড়ে এবং তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় মস্কো থেকে ১০০০ কিলোমিটার দূরের কোনও জায়গায়। পুরানো সোভিয়েত ইউনিয়নের ভিনরাজ্য থেকে আসা শ্রমিকরা আশ্রয় নেয় কোনও বাগানের গাছপালা সংরক্ষণের ঘরগুলিতে কিম্বা কারখানাতেই, নয়ত রাত কাটায় কোনও গ্যারাজে। (সূত্র ঃ সলিডেয়ার ১৫-২-০৬)

১০০ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্পে কাজের দাবিতে ডেপুটেশন

বিপিএল তালিকাভুক্ত গ্রামীণ গরিবদের জন্য বছরে ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি আইন করে ইউ পি এ সরকার বিরাট সাফল্য বলে দাবি করলেও বাস্তবে যে কাজের ব্যবস্থা হয়নি, গ্রামীণ গরিবরা বুঝতে পারলেন কাজ চাইতে গিয়ে। ১৫ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনী থানার ৬নং ভীমপুর অঞ্চলে ৫ শতাধিক কৃষক ও খেতমজুর এস ইউ সি আই দলের নেতৃত্বে এক হাজার খেতমজুরের কাজের জন্য আবেদনপত্র জমা দিতে এসেছিলেন। প্রথমে কিছু আবেদনপত্র জমা নিলেও পরে অঞ্চলপ্রধান জমা নেওয়ার নির্দেশ নেই বলে আবেদনপত্র নিতে অস্বীকার করেন। এতে উপস্থিত কৃষক ও খেতমজুররা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। অবশেষে অঞ্চল প্রধান লিখিতভাবে দু'দিনের মধ্যে আবেদন জমা নেওয়ার কথা ঘোষণা করলে আন্দোলনকারী কৃষকরা ঘেরাও তুলে নেন। ভীমপুর থেকে পাথরপাড়া রাস্তা দ্রুত তৈরি, কুমীরকাতা স্কুলের সরকারি অনুমোদন, বি পি এল কার্ড প্রদান, ফসলের উপযুক্ত দাম প্রভৃতি দশ দফা দাবিতে ছিল এদিনের ডেপুটেশন। অঞ্চল প্রধান কিছু দাবি পূরণের আশ্বাস দেন। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন কমরেডস মতিলাল মাহাত, প্রাণতোষ মাইতি, প্রভঞ্জন জানা, দিলীপ দাস প্রমুখ। বক্তারা বলেন, সিপিএম-সিপিআই সমর্থিত কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকার খেতমজুরদের সারা বছর কাজের দাবির প্রতি কোন গুরুত্ব দেয়নি, ১০০ দিন কাজ দেওয়ার প্রকল্প এখনও ফাইল বন্দী। লড়াই করে তা আদায় করতে হবে।

পূর্ব মেদিনীপুরে শ্রমজীবী মানুষদের অবস্থান ডেপুটেশন

১৮ ফেব্রুয়ারি পূর্ব মেদিনীপুর জেলাশাসক দপ্তরে পাঁচ শতাধিক শ্রমজীবী মানুষ অবস্থান ডেপুটেশনে অংশ নেন। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মধুসূদন বেরার নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দেয়। বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির প্রশ্নে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা, ভূমি সংস্কার দপ্তরের ওয়াটার কেরিয়ার ও সুইপারদের বেতন বৃদ্ধির এবং অসংগঠিত শ্রমিকদের পরিচয়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার আশ্বাস দেওয়া হয়। অবস্থান মঞ্চে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক সিদ্ধার্থ মহাপাত্র, বিবেক রায় প্রমুখ। সভার শেষে শ্রমিকদের লাগাতার আন্দোলনে অংশ নেওয়ার আবেদন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই জেলা সম্পাদক মানব বেরা।

ধারাবাহিক গণআন্দোলনে এস ইউ সি আই

[জনগণের উপর সরকার, মালিকশ্রেণী ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন সংগঠিত করাই এস ইউ সি আই-এর বিপ্লবী রাজনীতির মূল কথা। কারণ, আন্দোলন ছাড়া মানুষের দাবি আদায়ের অন্য কোন পথ নেই। জন্মলগ্ন থেকেই এস ইউ সি আই জনগণের বিভিন্ন অংশের নানা দাবি ও সমস্যা নিয়ে রাজ্যে, জেলায় জেলায় ও আঞ্চলিক স্তরে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে আসছে। ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণে বহু ক্ষেত্রেই এসেছে সাফল্য। জনগণ বড় আশা নিয়ে তাকিয়ে আছে এই দলটির দিকে। তারা দেখছে, এই দলটির নেতা-কর্মীরা রক্ত ঢেলেছে, প্রাণ দিয়েছে, অত্যাচার ও কারাবরণ সহ্য করেছে, কিন্তু গণআন্দোলনের পথ থেকে সরে আসেনি। তারই সামান্য কিছু নজির এখানে তুলে ধরা হল। এর বাইরেও থেকে গেল অসংখ্য আন্দোলন ও সাফল্যের ইতিহাস।]

শিক্ষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক বিজয়

কংগ্রেসের অনুসরণে সিপিএম ফ্রন্ট সরকারও পশ্চিমবঙ্গে সরকারি ক্ষমতায় এসেই শোষিত মানুষকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখতে একের পর এক পদক্ষেপ নিতে শুরু করে। উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যম ইংরেজি ভাষা শিক্ষাকে প্রাথমিক স্তর থেকে তুলে দেয়, পাশফেল প্রথা বাতিল করে। আপামর জনগণকে সংগঠিত করে এস ইউ সি আই দল দীর্ঘ ১৯ বছর ধরে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে এবং সফল ঐতিহাসিক বন্‌ধের মাধ্যমে ইংরেজি পুনঃপ্রবর্তনে সরকারকে বাধ্য করে। গণআন্দোলনের এ হল এক ঐতিহাসিক বিজয়, যা পশ্চিমবঙ্গের আপামর জনগণের মনে গাঁথা হয়ে আছে। শিক্ষার মানোন্নয়নের স্বার্থে সরকারবিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি দলের উদ্যোগে চলছে প্রাথমিক স্তরে পরীক্ষা ও বৃত্তি প্রদান। উচ্চতম স্তর পর্যন্ত সকল ছাত্রের শিক্ষার সুযোগ, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ-সাম্প্রদায়িকীকরণের পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার দাবিতে সর্বভারতীয় স্তরের সঙ্গে এ রাজ্যেও চলছে 'সেভ এডুকেশন' আন্দোলন। ফি কমানো, আসন বাড়ানো, দুর্নীতি রোধ প্রভৃতি বহু দাবি আদায় হয়েছে আন্দোলনের মাধ্যমে। আর এই ঐতিহাসিক শিক্ষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এসেছেন দেশের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ্, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষক সহ অসংখ্য অভিভাবক, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুবক, মহিলারা।

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি ও বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন ও জয়

রাজ্যের সিপিএম সরকার কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের নয়া বিদ্যুৎনীতি মেনে নিয়ে এরাজ্যেও ক্রমাগত বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে চলেছে। ফলে তা ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। রাজ্য সরকারের এই জনবিরোধী বিদ্যুৎনীতি ও মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এস ইউ ইউ সি আই-এর উদ্যোগে গড়ে ওঠা বিদ্যুৎগ্রাহকদের সংগঠন অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের (অ্যাবেকা) লাগাতার আন্দোলন বহুক্ষেত্রে যেমন রাজ্য সরকারকে গৃহীত সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হঠতে বাধ্য করেছে তেমনই ছিনিয়ে এনেছে বহু জয়।

২৭ জানুয়ারি, '০৩-এর বাংলা বন্‌ধে শিক্ষা, চিকিৎসা, পরিবহন প্রভৃতির সাথে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি রোধ ছিল অন্যতম দাবি। বন্‌ধে রাজ্যের মানুষের ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করে রাজ্য সরকার সাময়িকভাবে পিছু হঠে, বিদ্যুতের অভিন্ন মাশুলনীতি স্থগিত করে। ২০০৩ সালের ২৯ মে অতিরিক্ত সিকিউরিটি চার্জের প্রতিবাদে হাজার হাজার বিদ্যুৎগ্রাহক বিদ্যুৎমন্ত্রীর দপ্তর মহাকরণে তুমুল বিক্ষোভ দেখায়। ২০ জুন, ২০০৩ থেকে রাজ্যে লাগাতার বিদ্যুৎ বিল বয়কট শুরু করেন গ্রাহকরা। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বয়কট আন্দোলনে পুলিশ ও সিপিএমের ঠ্যাঙাড়েবাহিনী হামলা চালায়। ২৪ জুন 'অ্যাবেকা'র সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাসকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ১৯ জুলাই '০৩ সারা রাজ্যে বিদ্যুৎ আলো বর্জন আন্দোলনে গ্রাহকরা বিভিন্ন স্থানে মোমবাতি নিয়ে মিছিল করেন।

আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ২৯ জুন '০৫ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ অফিসে হাজার হাজার গ্রাহক বিক্ষোভ দেখান। ১৯ জুলাই রাজ্যব্যাপী ১ ঘণ্টা পথ অবরোধে ব্যাপক সংখ্যক কৃষক অংশগ্রহণ করেন। ২৫ আগস্ট হাজার হাজার কৃষকের দৃপ্ত মিছিলে কেঁপে ওঠে কলকাতা মহানগরী। কিন্তু চূড়ান্ত জনস্বার্থবিরোধী সিপিএম সরকার সাধারণ গ্রাহকদের দাবিতে কর্ণপাতই করেনি শুধু নয়, ২৭ অক্টোবর রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ দপ্তরের সামনে কৃষকদের বিক্ষোভে নৃশংসভাবে লাঠি-গ্যাস-গুলি চালায় পুলিশ, বর্বরতায় যা একমাত্র গুরগাঁও-এ পুলিশি অত্যাচারের সঙ্গেই তুলনীয়। পুলিশের গুলিচালনায় বুলেটবিদ্ধ হয়েছেন নদীয়ার খুদ্দার শেখ, উত্তর ২৪ পরগণার রামপ্রসাদ সরকার; গুরুতর আহত হন ৮০ বছরের প্রবীণ কৃষক সহ ১৬ জন। পুলিশ ৫২ জনকে গ্রেপ্তার করে জামিন না দিয়ে জেল হাজতে পাঠায়। ৩ জানুয়ারি '০৬ হাজারেরও বেশি কৃষক এসপ্ল্যানেডে আমরণ অনশনে বসেন। চারদিন অনশনে অসুস্থ হয়ে পড়েন অনেকেই। পুলিশ অনেককেই জোর করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রী দাবি মেনে নিয়ে ২০ কোটি টাকা ভর্তুকি, আহতদের ক্ষতিপূরণ ও চিকিৎসার দায়িত্বের কথা ঘোষণা করেন। সরকার প্রতিশ্রুতি রক্ষায় টালবাহানা করলে পুনরায় ২১ জানুয়ারি '০৬ বিদ্যুৎপর্ষদের চেয়ারম্যানের সাথে অ্যাবেকা নেতৃত্বের বৈঠক হয়। অনশন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আদায় করা ২০ কোটি টাকা ভর্তুকিতে মিটারবিহীন কৃষিবিদ্যুৎ গ্রাহকদের গড়ে বছরে ২০০০ টাকার মতো মাশুল কমেছে।

হাসপাতালে চার্জবৃদ্ধির প্রতিবাদে

জনস্বাস্থ্যকে কার্যত বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার একদিকে সরকারি চিকিৎসাব্যবস্থাকে পরিকল্পিতভাবে দুর্বল করছে, অন্যদিকে বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবসাকে উৎসাহিত করছে। এই চূড়ান্ত জনস্বার্থবিরোধী স্বাস্থ্যনীতির বিরুদ্ধে ডাক্তার, নার্স সহ চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত নানা স্তরের মানুষ, বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষকে নিয়ে এস ইউ সি আই গড়ে তুলেছে 'হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি'। কমিটির ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলে রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে বর্ধিত চার্জের কোন কোন ক্ষেত্রে ৪০% — ৫০% পর্যন্ত হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। আর জি কর হাসপাতালে 'কার্ডিও ভাসকুলার সায়েন্স' বিভাগের বেসরকারীকরণ রুখে দেওয়া গেছে। যাদবপুর কে এস রায় টিবি হাসপাতাল বিক্রি করে দেওয়া এবং মানকুণ্ডু মানসিক হাসপাতাল ও ধুবুলিয়া টিবি হাসপাতাল বন্ধ করে দেওয়ার বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন হয়েছে। আর্সেনিক আক্রান্তদের জন্য পি জি ও ট্রপিক্যালে ফ্রি চিকিৎসার দাবি আদায় করা গেছে। আন্দোলনের চাপে মেডিক্যাল কলেজে মেধাতালিকা অগ্রাহ্য করে ক্যাপিটেশন ফি'র বিনিময়ে ৬৯ জন অনাবাসী ছাত্রছাত্রীর ভর্তি বাতিল করে জয়েন্ট এন্ট্রান্সে উত্তীর্ণদের ভর্তির ন্যায্য দাবি মানতে বাধ্য হয়েছে রাজ্য সরকার এবং ছাত্রদের দায়ের করা মামলার ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ক্যাপিটেশন ফি না নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। লাগাতার আন্দোলনের চাপে দফায় দফায় এ পর্যন্ত ১৫১২ জন নার্সের স্থায়ী চাকরি হয়েছে। এছাড়াও ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে জরুরিকালীন তৎপরতায় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে কলকাতা পুরসভায় বিক্ষোভ সংগঠিত হয়েছে।

জেলায় জেলায় প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রগুলিকে 'পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপে'র নামে বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি কার্যকরী আন্দোলন গড়ে তুলেছে এবং বেসরকারি মালিকদের হাতে তা তুলে দেওয়া বা বন্ধ করে দেওয়া রুখে দিতে পেরেছে। বহু প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রে ডাক্তার, নার্স বা স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ এবং ওষুধ সরবরাহের দাবি আদায় করা সম্ভব হয়েছে।

ভাড়াবৃদ্ধি প্রতিরোধে

রাজ্যে সিপিএম পরিচালিত ফ্রন্ট সরকারের যে সমস্ত কার্যকলাপ জনজীবনে দুরবস্থা আরও বাড়িয়ে তুলেছে তার মধ্যে অন্যতম হল বছরে বছরে বাস - মিনিবাস - ট্যাক্সি - লঞ্চের ভাড়াবৃদ্ধি। এই ভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই প্রথম থেকেই লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে আসছে। বহু ক্ষেত্রেই ভাড়া কমাতে বাধ্য করেছে সরকার অথবা মালিকদের। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সরকার আন্দোলনের উপর ঠ্যাঙাড়েবাহিনী ও পুলিশ নামিয়ে অকথ্য অত্যাচার চালায়। '৮৩ সালে বাসভাড়াবৃদ্ধিবিরোধী আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত হন হাবুল রজক ও শোভারাম মোদক। '৯০ সালে পুলিশের গুলিতে নিহত হন কমরেড মাধাই হালদার, গুলিবিদ্ধ হন আরও ৩২ জন আন্দোলনকারী। '০২ সালে ৬ আগস্ট এসপ্লানেডে পুলিশ মহিলা কর্মীদের প্রকাশ্যে বিবস্ত্র করে। '০৩ সালের ৩০ মে-র আন্দোলনে সরকার পুনরায় পুলিশি বর্বরতা নামিয়ে আনে। '০৫ সালে ৩০ সেপ্টেম্বর ভাড়াবৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনে পুলিশ লাঠিচার্জ করে।

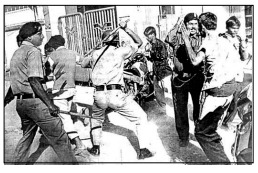

সরকারের অবিরাম ভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে যেতে যাত্রী ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গঠিত হয়েছে 'পরিবহণ যাত্রী কমিটি'। এছাড়াও আন্দোলনের চাপে জেলায় জেলায় বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহার, বন্ধ হয়ে যাওয়া রুট চালু প্রভৃতি দাবি আদায় করা সম্ভব হয়েছে।

চারের পাতায় দেখুন

অব্যাহত আন্দোলন দাবিও আদায় করছে

তিনের পাতার পর

সুন্দরবনের পরিবেশ রক্ষার্থে

দেশি-বিদেশি মালিক পুঁজিপতিদের সন্তুষ্ট করতে দেশের কল-কারখানা নদী-জল-খনি-বন-জঙ্গল প্রভৃতি সম্পদকে তাদের হাতে তুলে দিচ্ছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি। এ রাজ্যে সুন্দরবনের ৯০০০ বর্গ কিমি এলাকা ট্যুরিজমের নামে সাহারা কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়ার চুক্তি করেছে সিপিএম সরকার।

এই চুক্তির ফলে হাজার হাজার দরিদ্র কৃষক তাঁদের বেঁচে থাকার শেষ সম্বলটুকু হারাবেন। ইতিমধ্যেই যে কয়েক লক্ষ দরিদ্র মানুষ নদীতে মীন ধরে জীবনযাপন করতেন, তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, মৎস্যজীবীদের ওপর আরোপ করা হয়েছে নানা বিধিনিষেধ। সর্বোপরি এই চুক্তি অনুযায়ী ট্যুরিজম কেন্দ্র গড়ে উঠলে তা হবে বেলেল্লাপনার কেন্দ্র; সুন্দরবন হারাবে তার সংস্কৃতি ও নিজস্বতা। এলাকার দরিদ্র মহিলারা হবেন ধনীদের লালসার শিকার। এর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই স্থানীয় মানুষকে সংগঠিত করে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছে, গঠিত হয়েছে অসংখ্য প্রতিরোধ কমিটি। সেগুলোকে সংগঠিত রূপ দিতে তৈরি হয়েছে 'সুন্দরবন জনস্বার্থ ও পরিবেশ রক্ষা কমিটি।' সংগঠিত হয়েছে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, কনভেনশন, সমাবেশ। সরকার ও সাহারা কোম্পানি আপাতত পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছে।

সুন্দরবন অঞ্চলের কুলতলি ব্লকের গুড়গুড়িয়া-ভুবনেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া হুকাহারানিয়া নদী বেঁধে জলাধার তৈরির নামে মেছোঘেরি তৈরি করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে সিপিএম সরকার। নদীর দুটি মুখ বেঁধে দিয়ে, ম্যানগ্রোভ অরণ্য কেটে ধ্বংস করেছে। এর ফলে আশেপাশের ৮/১০টি অঞ্চলের হাজার হাজার মৎস্যজীবীর জীবন জীবিকা ধ্বংসের মুখে। মৎস্যজীবীদের রায়দিঘী ও ঢাকির মুখ পর্যন্ত যেতে ৪০-৪৫ কিমি বেশি ঘুরতে হচ্ছে। প্রতিবাদে এস ইউ সি আই-এর উদ্যোগে লাগাতার কনভেনশন, হাটসভা, পথসভা, সাইকেল মিছিল প্রভৃতির মাধ্যমে তীব্র জনমত গড়ে উঠেছে। কুলতলির বিধায়ক প্রবোধ পুরকাইতের নেতৃত্বে আইনি লড়াইও পরিচালিত হয়েছে। এখন সরকার স্থায়ীভাবে নদী বাঁধার কাজ থেকে পিছু হঠেছে।

সুন্দরবন অঞ্চলে অন্য কোনও শিল্প-কারখানা গড়ে তোলার উদ্যোগ না নিয়ে ২০০০ সালে একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের কেন্দ্রীয় প্রস্তাবে রাজ্যের সিপিএম সরকার সম্মতি দেয়। পারমাণবিক বিদ্যুৎ লাভজনক নয়, পারমাণবিক বর্জ্যে যে তেজস্ক্রিয়তা ঘটে তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এতদ্‌সত্ত্বেও এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের একটিই উদ্দেশ্য — তা হল পারমাণবিক অস্ত্র বানানো। স্বাভাবিকভাবেই এস ইউ সি আই এর প্রতিরোধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। শেষ পর্যন্ত সিপিএম পিছু হঠতে বাধ্য হয়।

সুন্দরবন অঞ্চলে স্থায়ীভাবে নদীবাঁধ নির্মাণ, ভেঙে যাওয়া বাঁধ দ্রুত নির্মাণ, শুখা মরশুমে বাঁধ মেরামতির কাজ শেষ করা, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য দ্রুত ত্রাণ ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা প্রভৃতি দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলেছে পাথরপ্রতিমা ব্লক নাগরিক কমিটি।

জলনিকাশির প্রধান পথ সাতপুকুরিয়া নদী দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় মথুরাপুর ১নং ব্লক সহ কুলপি ব্লকের চণ্ডীপুর, গাজিপুর-রামকৃষ্ণপুর, ঢোলা এবং মন্দিরবাজার ব্লকের গাববেড়িয়া, ঘাটেশ্বর অঞ্চলে হাজার হাজার বিঘার আমন চাষ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। সংস্কারের জন্য সেচ বিভাগের ১০ লক্ষ টাকা সিপিএম পরিচালিত মথুরাপুর পঞ্চায়েত সমিতি আত্মসাৎ করে। এর বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। রায়দিঘিতে সিপিএম পরিচালিত পঞ্চায়েত কর্তৃক মিড ডে মিলের হাজার হাজার মণ চাল আত্মসাৎ করার ঘটনা হাতেনাতে ধরে তার বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা হয়।

রাস্তা সংস্কার

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সিপিএমের নেতা-মন্ত্রীরা যখন উন্নয়নের ফিরিস্তি দিয়ে চলেছেন তখন দেখা যাচ্ছে, বাস্তবে রাস্তা নির্মাণ, রাস্তা সংস্কারের মতো সামান্য দাবি আদায়ের জন্যও মানুষকে আন্দোলনে নামতে হয়েছে। কোথাও স্বাক্ষর সংগ্রহ করে ডেপুটেশন, কোথাও অবরোধ সংগঠিত করতে হয়েছে। মুর্শিদাবাদের ধূলিয়ানে রাস্তা সংস্কারের দাবিতে ছাত্র-ছাত্রীরা পথ অবরোধ করে এবং দাবি আদায় করে। রাস্তা মেরামতের দাবিতে নামখানায় ৪৮ ঘণ্টা বন্ধ পালিত হয়, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দাবি মেনে নেয় প্রশাসন। মন্দিরবাজারে অসমাপ্ত রাস্তা শেষ করা ও ভেঙে পড়া সেতু সংস্কারের দাবিতে হাজার হাজার মানুষ পথ অবরোধ করেন। ১৫ দিনের মধ্যে রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হয়। পুরুলিয়ায় রাস্তা সংস্কারের দাবিতে ও ভগ্ন সেতু মেরামতির দাবিতে নিতুরিয়ায় স্বাক্ষর সংগ্রহ, ডেপুটেশন এবং অবশেষে রাস্তা অবরোধ করা হয়। প্রশাসন রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু করে। মেদিনীপুরের মেচেদায় রেলস্টেশন ও কেন্দ্রীয় বাসস্ট্যান্ডে যাওয়ার জন্য ৪০নং জাতীয় সড়ক থেকে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত রাস্তাটি সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ হয়। ২ দিনের মধ্যে রাস্তা সারানোর কাজ শুরু করে হাইওয়ে দপ্তর।

চাষী আন্দোলন

'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ' — একথা বলতে বলতেই রাজ্যের সিপিএম সরকার কৃষির ভিত্তিমূলে আঘাত করে চলেছে। চাষীর কাছ থেকে হাজার হাজার একর চাষযোগ্য জমি কেড়ে নিয়ে বিদেশি মালিক সালিম গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়ায় হাজার হাজার কৃষক জমি হারিয়ে ভূমিহীনে পরিণত হচ্ছে।

একদিকে সার, বীজ সহ কৃষি সরঞ্জামের ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে, অন্যদিকে ফসলের ন্যায্যমূল্য না পাওয়ার ফলে কৃষকরা শুধু সর্বস্বান্ত হচ্ছে তাই নয়, আত্মহত্যা করতেও বাধ্য হচ্ছে। সরকারের সরবরাহ করা বন্ধ্যা বীজ চাষ করে নিষ্ফলা খেতে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া ছাড়া সর্বস্বান্ত কৃষকের অন্য কোন পথ থাকছে না। এছাড়াও পঞ্চায়েতি ট্যাক্সের নামে আরও এক দফা ট্যাক্সের বোঝা ছাড়াও গত ২৪ বছরের বকেয়া খাজনার বোঝা সহ নানা ধরনের ট্যাক্সের বোঝা সরকার কৃষক-সাধারণ গ্রামীণ মানুষের উপরে চাপিয়ে দিয়েছে। সরকারের এই চূড়ান্ত কৃষকস্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে একমাত্র এস ইউ সি আই এবং তার কৃষক ও খেতমজুর সংগঠন আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর কৃষক ও খেতমজুর জীবনের সমস্যাগুলি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে রাজ্য কনভেনশনে কয়েক হাজার কৃষক ও খেতমজুর যোগ দেন। ১৪ নভেম্বর হাজার হাজার কৃষক ও খেতমজুর কলকাতায় আইনঅমান্য করে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন। এছাড়াও জেলায় জেলায় কৃষকদের নানা দাবিতে আন্দোলন গড়ে উঠছে। কোচবিহারের হলদিবাড়ি পাটচাষী সংগ্রাম কমিটি পাটের ন্যায্যমূল্য এবং জেসিআই কর্তৃক পাট কেনার দাবি জানিয়ে জেসিআই ম্যানেজারকে ডেপুটেশন দেয়। টমেটো তোলার সময়ে ব্যবসায়ীদের দাম কমিয়ে রাখার বিরুদ্ধে বিডিও'র কাছে ডেপুটেশন দেয় কৃষক সংগ্রাম সমিতি। পঞ্চায়েতি ট্যাক্স চাপানোর প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে উঠেছে মেদিনীপুর, কোচবিহার, নদীয়া ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন পঞ্চায়েতে। উত্তর ২৪ পরগণার আর আই অফিসের দুর্নীতি ধরে হাজার হাজার টাকা চাষীদের ফেরৎ করানো হয়েছে। আন্দোলনের চাপে নিয়মবহির্ভূত খাজনা আদায় অনেকটাই বন্ধ করা গেছে। কয়েক হাজার কৃষকের প্রায় আড়াই কোটি টাকার ঋণ মকুব করানো হয়েছে। আন্দোলন চাপে পাঁশকুড়া পুরসভার বর্ধিত খাজনা প্রত্যাহার করানো সম্ভব হয়েছে।

শ্রমিক আন্দোলন

দেশের সরকারি বামপন্থী দলগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থক হওয়ায় কংগ্রেস জোট সরকার বেপরোয়াভাবে আক্রমণ নামিয়ে আনছে শ্রমিকশ্রেণীর উপর। শ্রমসংস্কারের নামে নিত্যনতুন আইনের মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের অধিকারগুলি যেমন কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, তেমনই কলেকারখানায় শ্রমিকদের বাধ্য করা হচ্ছে কালাচুক্তি মেনে নিতে। এর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সংগঠন হিসাবে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী আপসহীন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

২০০২ সালে চটশিল্পে উৎপাদন ভিত্তিক বেতন, একই কাজে দু'ধরনের বেতন সংক্রান্ত কালাচুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে সিপিএম, সিপিআই, কংগ্রেস পরিচালিত ইউনিয়নগুলি। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর প্রবল বিরোধিতায় এই চুক্তি চালু করা যায়নি। নৈহাটি জুটমিলে আটটি ইউনিয়ন গোপনে ম্যানেজমেন্টের সাথে চক্রান্ত করে স্থির করেছিল, সারা মিলে মজুরদের স্থায়ী কাজগুলি কন্ট্রাক্টরদের হাতে তুলে দেবে। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর অনমনীয় মনোভাব ও আন্দোলনের ফলে তা বানচাল হয়ে যায়।

চা-শিল্পেও অনুরূপ কালাচুক্তির বিরুদ্ধে ও বন্ধ কারখানাগুলি খোলার দাবিতে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী ঐতিহাসিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

মজুরিবৃদ্ধি, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা আদায় প্রভৃতি বিড়ি শ্রমিকদের বহু দাবি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আদায় হয়েছে। এই আন্দোলনে বিড়ি-শ্রমিক কমরেড মুজিবর শেখ শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন। পুরুলিয়া জেলা বিড়ি শ্রমিক সংঘের নেতৃত্বে বিড়ি শ্রমিকরা পরিচয়পত্রের দাবি আদায় করেছেন। উত্তর ২৪ পরগণা ও নদীয়ার বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে শ্রমিকরা মজুরিবৃদ্ধির দাবি আদায় করেছেন।

শোষিতশ্রেণীর সর্বনিম্নস্তরে রয়েছেন গৃহপরিচারিকারা। অন্যের ঘর সামলাতে নিজেদের ঘরের পানে তাকানোর যাঁদের ফুরসত হয় না, তাঁদের বেদনাকে ভাষা দিতে, সরকারের কাছে শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বিপিএল তালিকাভুক্তি, স্বাস্থ্যবীমা, রেলের স্বল্পমূল্যের মাসিক টিকিট প্রভৃতি দাবি তুলে ধরতে গড়ে উঠেছে সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতি। কেন্দ্রীয়ভাবে এবং জেলায় জেলায় হাজার হাজার পরিচারিকার

পাঁচের পাতায় দেখুন

যেখানেই অন্যায়-অবিচার-আক্রমণ সেখানেই প্রতিবাদ-প্রতিরোধ

চারের পাতার পর

লাগাতার আন্দোলনের ফলে বন্ধ হয়ে যাওয়া রেলের স্বল্পমূল্যের মাসিক টিকিট পুনরায় চালু হয়েছে। এছাড়াও পরিচারিকাদের উপর শারীরিক নির্যাতন, ধর্ষণ ও খুনের বিরুদ্ধেও আন্দোলন-প্রতিবাদ গড়ে তোলা হয়েছে, বহুক্ষেত্রে অপরাধীদের শাস্তিও হয়েছে।

ফিসারমেন ইউনিয়নের নেতৃত্বে দরিদ্র মৎস্যজীবীরা ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি এবং জলপথ ব্যবহারের জন্য রাজ্য সরকারের চাপানো বিপুল ট্যাক্সের বিরুদ্ধে এবং জলদস্যুদের হাত থেকে নিরাপত্তা, প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের জন্য ব্যাঙ্ক ঋণ ও সরকারি অনুদানের দাবিতে লাগাতার আন্দোলন করে বহু দাবি আদায় করেছেন।

শহরকে সুন্দর করার অছিলায় কোন পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে নির্বিচারে হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে সারা বাংলা হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতি লাগাতার আন্দোলন চালিয়েছে এবং বহুক্ষেত্রে উচ্ছেদ রুখে দিতে সক্ষম হয়েছে। রঘুনাথপুর, আদ্রা, সাঁওতালডি, বর্ধমান, মেদিনীপুরে হকাররা উচ্ছেদ রুখে দিতে সক্ষম হয়েছে।

এছাড়াও অসংগঠিত ক্ষেত্রে রিক্সা, নির্মাণ, ইটভাটা, ধানকল, কাঁসা-পিতল-তাঁত, মুটে-মজুর, দড়ি বয়ন প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নানা দাবি আদায় সম্ভব হয়েছে।

মদের লাইসেন্সের বিরুদ্ধে আন্দোলনে জয়

সারা দেশের সাথে এ রাজ্যেও যখন বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, ছাঁটাই, লে-অফ, লক-আউটে সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত, যখন বিশ্বায়ন উদারীকরণের সীমাহীন শোষণের বিরুদ্ধে মেহনতি মানুষের ঐক্যবদ্ধ, সচেতন সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা ক্রমাগত বেশি করে অনুভূত হচ্ছে, তখন এ রাজ্যে সিপিএম পরিচালিত রাজ্য সরকার হাজার হাজার নতুন মদের দোকানের লাইসেন্স দিয়ে চলেছে। ফলে কর্মহীন, অসচেতন যুবসমাজের একটা বিরাট অংশ মদের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে, চুরি-ছিনতাই, মহিলাদের সম্ভ্রমহানি, ধর্ষণের ঘটনা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। মদের ঢালাও লাইসেন্সের এই সরকারি নীতির বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই, স্থানীয় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বিশেষ করে মহিলাদের সহযোগিতায় লাগাতার প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, উত্তর ২৪ পরগণা, হাওড়া সহ অন্যান্য জেলায় বহু মদের দোকান বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

ছাত্র আন্দোলন

উদারীকরণ, বেসরকারীকরণের নীতি মেনেই রাজ্যে সিপিএম পরিচালিত রাজ্য সরকার শিক্ষার মতো একটি অত্যাবশ্যকীয় ক্ষেত্রকেও একদিকে বেসরকারি হাতে তুলে দিচ্ছে অপরদিকে সরকারি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক ফি-বৃদ্ধি ঘটিয়ে, ডোনেশন, ক্যাপিটেশন ফি চালু করে শিক্ষাকে সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও আন্দোলন করে বহুক্ষেত্রেই ফি বৃদ্ধি রুখে দিতে সক্ষম হয়েছে, ডোনেশন-ক্যাপিটেশন ফি চালু করার চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে।

ডি ওস ও'র মেডিকেল ইউনিটের আন্দোলনের চাপে মেডিকেলে এন আর আই কোটায় ভর্তি বাতিল করে জয়েন্ট এনট্রান্সে উত্তীর্ণদের ভর্তি করতে বাধ্য হয়েছে সরকার। মালদহ, মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, বীরভূম, বাঁকুড়া, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর সহ বিভিন্ন জেলায় স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, বর্ধিত ভর্তি ফি আদায় এবং তফসিলি জাতি-উপজাতি ছাত্রদের স্টাইপেন্ড আটক রাখা ইত্যাদি রদ হয়েছে আন্দোলনের মাধ্যমে।

নারী নির্যাতন

সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী যত বলছেন এ রাজ্য আইনশৃঙ্খলার 'মরূদ্যান', তত কংগ্রেস, বিজেপি সরকার পরিচালিত রাজ্যগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নারী নির্যাতনের ঘটনা। বেশ কিছু ক্ষেত্রে শাসক দলগুলির নেতা-কর্মীরাও ঐসব নারকীয় ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। ধর্ষণ, হত্যা, নারীপাচার, অশ্লীল সিনেমা, বিজ্ঞাপন প্রভৃতির বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই দল এবং মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন, ডি ওয়াই ও, ডি এস ও লাগাতার প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। বহু ক্ষেত্রেই বন্ধ হয়েছে অশ্লীল সিনেমার প্রদর্শন, ধর্ষণকারী ও হত্যাকারীর শাস্তি হয়েছে, উদ্ধার হয়েছে পাচার হয়ে যাওয়া মহিলারা। 'জীবনশৈলী'র নামে স্কুলে যৌনশিক্ষার নবতম সরকারি আক্রমণের বিরুদ্ধে চলছে ধারাবাহিক আন্দোলন।

বন্যা-ভাঙন-খরা প্রতিরোধ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটি দীর্ঘদিন ধরেই বন্যা, গঙ্গা-পদ্মা ভাঙনের সমস্যা, বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন দক্ষিণ ২৪ পরগণার দ্বীপাঞ্চলে ভাঙনের সমস্যা, এবং পুরুলিয়া-বাঁকুড়া সহ কয়েকটি জেলার খরার সঙ্কটে জর্জরিত। ২০০০ সালের বিধ্বংসী বন্যায় হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু সহ এ রাজ্যের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

বিপন্নদের উদ্ধার এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত উদাসীনতা ও নিষ্ঠুর দায়িত্বহীনতার প্রতিবাদে, বন্যা-ভাঙন রোধের নামে কন্ট্রাক্টর-দুর্বৃত্তচক্রের কোটি কোটি টাকা লুঠের তাণ্ডব প্রতিরোধে এবং বন্যা-ভাঙন ও খরাপীড়িত সাধারণ মানুষকে বাঁচানোর দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত করা হয়েছে। জেলায় জেলায় গড়ে উঠেছে বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটি, খরা প্রতিরোধ কমিটি, গড়ে উঠেছে গণআন্দোলন। সঙ্গে সঙ্গে সরকার ও প্রশাসনের দেখা পাওয়া গেছে — লাঠি-বন্দুক হাতে আন্দোলন দমনকারীর ভূমিকায়।

২০০০ সালের ১৭ জুলাই মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলায় মানুষ জড়ো হয়ে ভাঙনরোধের নামে অর্থ আত্মসাতের অপকর্ম রুখে দেয়। পুলিশের গুলিতে শহীদের মৃত্যুবরণ করেন নহিরুদ্দিন। প্রতিবাদে ১৯ জুলাই ২৪ ঘণ্টার সর্বাত্মক বন্ধ পালিত হয় গোটা মুর্শিদাবাদে। প্রবল বিক্ষোভের চাপে জেলা প্রশাসন বর্ষায় বোল্ডার ফেলার কাজ বন্ধ করার কথা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়।

এরপর দোষী পুলিশকর্মীদের শাস্তি, বন্যা-ভাঙনের স্থায়ী সমাধান সহ আরও কয়েকটি দাবিতে বহরমপুরে গণআইন অমান্যের ডাক দেওয়া হয়। পুলিশ প্রশাসন বন্যা-দুর্গতদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃবৃন্দ সহ কিশোর ছাত্র-যুব-মহিলাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ বহরমপুর থানা হাজতে নির্মম লাঠির আঘাতে তাঁদের রক্তাক্ত ও অচৈতন্য করে দেয়। সংঘবদ্ধ আন্দোলনের চাপে সরকারের পক্ষ থেকে শহীদ নহিরুদ্দিনের পরিবারকে ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সাথে সাথে বুলেটবিদ্ধ আহতদেরও ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়।

২০০০ সালের বিধ্বংসী বন্যার পর ঐ বছরের ২৪ অক্টোবর বন্যায় মৃত মানুষদের স্মরণে গোটা রাজ্য জুড়ে এস ইউ সি আই আহূত শোকপালনের কর্মসূচিতে সামিল হয়েছিলেন সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ।

২০০০-এর ১০ নভেম্বর কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে ডঃ সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি নাগরিক কনভেনশন থেকে গঠিত সারা বাংলা বন্যা-ভাঙন-খরা প্রতিরোধ কমিটির নেতৃত্বে সরকারের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা, বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, সহ গোটা রাজ্য জুড়ে সাধারণ মানুষ পথসভা, কনভেনশন, রাস্তা অবরোধ, ডেপুটেশন, বিক্ষোভ প্রদর্শন, আইন অমান্যের মতো আন্দোলনের কার্যক্রম লাগাতার চালিয়ে যাচ্ছেন।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন

১৯৯১ সালে সোভিয়েট ইউনিয়ন সহ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও বিশ্বযুদ্ধের বিপদ বৃদ্ধি পেল — এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটি বিশ্বের দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দেয়। এই লক্ষ্য থেকে এস ইউ সি আই ১৯৯৪ সালে কলকাতায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্তর্জাতিক কনভেনশন আহ্বান করে। রাশিয়া, আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানি, বেলজিয়াম, তুরস্ক, কঙ্গো, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেপাল প্রভৃতি দেশ থেকে কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টির প্রতিনিধিরা যোগ দেন। ঐ কনভেনশন থেকেই গঠিত হয় অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরাম।

পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে ফোরামের শাখা গড়ে ওঠে। বিভিন্ন দেশে ও ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ ও ষড়যন্ত্রের প্রতিটি ঘটনায় ফোরাম সোচ্চার হয়েছে।

গণতন্ত্রের ধাঁচার আড়ালে স্বৈরতন্ত্রের পদধ্বনি

একের পাতার পর

পুরোপুরি নিষিদ্ধ করতে তারা পারেনি। অবশ্য একথাও ঠিক যে, 'মিছিল রাস্তার একপাশ দিয়ে করতে হবে', 'বৃহৎ জনসভা ছুটির দিনে করতে হবে' — এসব হুমকি পুরোপুরি কার্যকর করতে না পারলেও পরোক্ষভাবে খানিকটা নিয়ন্ত্রণ তারা চাপিয়ে দিয়েছে। ব্রিটিশ আমল থেকে যেখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়ে আসছে, শব্দদূষণের অজুহাতে সেই এসপ্ল্যানেডইস্টে বিক্ষোভ প্রদর্শনের অনুমতি দেওয়া তারা বন্ধ করেছে এবং নানা অজুহাতে আরও কিছু নিয়ন্ত্রণ আনার চেষ্টা করছে।

সঙ্কটগ্রস্ত প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াশ্রেণী গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করছে

এদেশে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে গণতান্ত্রিক অধিকার সঙ্কোচনের ইতিহাস দেখলেই বোঝা যাবে, কেন আজ বুর্জোয়াশ্রেণী নানাভাবে নিষেধাজ্ঞা এনে, গণআন্দোলনের কণ্ঠরোধ করতে চাইছে। বুর্জোয়াবিপ্লবের স্বর্ণযুগে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্য থেকে সামন্তী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যে প্রসারিত নাগরিক অধিকারের প্রতিশ্রুতি প্রগতিশীল বুর্জোয়াশ্রেণী দিয়েছিল, বাস্তবে স্বতোপ্রণোদিতভাবে সে অধিকার তারা জনগণকে দেয়নি। ক্ষমতাসীন হওয়ার পরই তা দেওয়ার রাশ তারা টেনে ধরে। বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রধান শক্তি জনগণকেএজন্য লড়তে হয়েছে। বুর্জোয়া বিপ্লবের চিন্তাবিদরা যে গণতন্ত্রের কথা বলেছিলেন, তার অনেকটাই জনগণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আদায় করে নেয়। এভাবেই বুর্জোয়া বিপ্লবের পর দীর্ঘ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে জনগণ নরনারী নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিকের ভোটাধিকার আদায় করে। পাশাপাশি এও সত্য যে, সামন্তী শাসনের বিরুদ্ধে যে উদার গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি বুর্জোয়া বিপ্লবে দেওয়া হয়েছিল এবং তার যতটা বাস্তবে রূপায়িত হয়েছিল ; ক্ষমতাসীন হওয়ার পর বুর্জোয়াশ্রেণী প্রায়শই তা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। কারণ, বুর্জোয়া ব্যবস্থা যেহেতু শোষণ ও সামাজিক অসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই শুরু থেকেই এই ব্যবস্থাকে শোষিত জনতার বিক্ষোভ ও আন্দোলনের মুখে পড়তে হয়েছে।

বুর্জোয়া ব্যবস্থায় শোষণ, অসাম্য, অবিচার যত বেড়েছে, বুর্জোয়া ব্যবস্থা যত সঙ্কটের মুখে পড়েছে এবং তা থেকে বাঁচতে শাসকগোষ্ঠী সঙ্কটের বোঝা যত বেশি জনগণের উপর চাপিয়েছে, ততই বেড়েছে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ ও প্রতিরোধ। গণআন্দোলনের সুযোগ কানুনী রাস্তায় ক্রমশ সঙ্কুচিত করতে ক্ষয়িষ্ণু প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াশ্রেণী তত বেশি বেশি গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের, বাকস্বাধীনতা এবং নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের কণ্ঠ আইনসভায় পৌঁছে দেওয়ার সামান্য অধিকারকে আরও সঙ্কুচিত করেছে। আমাদের দেশের মতো পশ্চাদপদ পুঁজিবাদী দেশে, বিশ্বপুঁজিবাদের তৃতীয় তীব্র বাজারসঙ্কটের যুগে বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রক্ষমতায় আসার কারণে, স্বাধীনতার সময় থেকেই যেহেতু সঙ্কটের ছায়া বুর্জোয়াশ্রেণীকে অনুসরণ করেছে, তাই সদ্যস্বাধীন ভারতে যে সংবিধানে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠনের, সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার শপথ ঘোষিত হয়েছে, সেই সংবিধানেই স্বৈরাচারী নিবর্তনমূলক আটক আইনের (পি ডি অ্যাক্ট) ব্যবস্থা করা হয়েছে। এইসব কালাকানুন সবসময়ই গণআন্দোলন দমন করতে গণআন্দোলনকারী নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। রাজনৈতিক দল গঠনের কোন সাংবিধানিক অধিকারের স্বীকৃতি এদেশে দেওয়া হয়নি। সভাসমিতি গঠনের জন্য প্রদত্ত 'রাইট টু ফর্ম অ্যাসোসিয়েশন'-এর উপর নির্ভর করে এদেশে রাজনৈতিক দল গঠিত হয় এবং তার স্বীকৃতি দেয় নির্বাচন কমিশন, সংবিধান নয়।

ব্রিটিশের মতোই স্বাধীনতার পর শাসক কংগ্রেস দল আন্দোলনের বিরুদ্ধে বারবার আইনশৃঙ্খলা ভাঙার অভিযোগ এনেছে, গণআন্দোলনের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে গুণ্ডামি, রাষ্ট্রদ্রোহিতার মিথ্যা অভিযোগ এনে তাদের জেলে পুরেছে, আন্দোলনের উপর লাঠিগুলি চালিয়েছে। কিন্তু জনগণের লড়াকু ভূমিকা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে জাগ্রত জনমত ক্রিয়াশীল থাকায় আইন করে গণআন্দোলনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে বা জনমতকে আন্দোলনবিরোধী করে তুলতে উল্লেখযোগ্যভাবে সফল হয়নি। কিন্তু সি পি আই, সি পি এম প্রমুখ তথাকথিত মার্ক্সবাদীদের সুবিধাবাদী, গদিসর্বস্ব, নীতিহীন আচরণের ফলে সাধারণ মানুষ বামপন্থা ও গণআন্দোলনের উপর আস্থা হারানোয় বুর্জোয়াশ্রেণী গণআন্দোলনের টুঁটি টিপে ধরার সুযোগ পেয়েছে। এর দ্বারা এই দলগুলি শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের সংগ্রামী সংঘবদ্ধতা ও আন্দোলনেরই শুধু চূড়ান্ত ক্ষতি করেনি, মার্ক্সবাদের মতো মহান আদর্শকেও জনগণের চোখে বহুল পরিমাণে হেয় করেছে। মূলত, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়েই শাসকশ্রেণী আজ গণআন্দোলনের উপর একের পর এক আঘাত হানতে সক্ষম হচ্ছে এবং সেই উদ্দেশ্য থেকেই নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্যে অল্প খরচে, দলের কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমে দেওয়াল লেখা ও পোস্টারিংয়ের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক প্রচারের যে সুযোগ প্রধানত গণআন্দোলনের শক্তিগুলি কাজে লাগাত সেই সুযোগকে আরও সঙ্কুচিত করা হচ্ছে। বাস্তবে দেওয়াল লিখন এবং পোস্টারিংয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির পিছনে প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তা বুঝতে হলে প্রথমেই বুঝতে হবে, এর ফলে কারা সুবিধা পাবে, আর কারা অসুবিধায় পড়বে।

গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রচারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে দেওয়াল লিখন এবং পোস্টারিং এদেশে এবং বিশ্বের বহু দেশে স্বীকৃত। একথাও সকলেরই জানা আছে যে, ধনীদের অর্থে পুষ্ট বুর্জোয়া দলগুলি কিছু কিছু দেওয়াল লেখা বা পোস্টারিং করালেও তারা আরও ব্যয়সাধ্য প্রচারই প্রধানত করে থাকে। গণআন্দোলনের শক্তি, প্রকৃত সংগ্রামী বামপন্থী দল, যারা মালিকশ্রেণীর দেওয়া কালো টাকায় পুষ্ট নয়, প্রধানত তারাই রাজনৈতিক ও নির্বাচনী প্রচারে কম খরচসাপেক্ষ প্রচারমাধ্যম হিসাবে দেওয়াল লিখন ও পোস্টারিংকে অবলম্বন করে। বৃহৎ, ক্ষমতাসীন বা ক্ষমতার দাবিদার বিকল্প সংসদীয় বিরোধী দল, যারা দেশের একচেটিয়া মালিকদের অর্থে পুষ্ট এবং সেবায় নিযুক্ত, চূড়ান্ত দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচারের সঙ্গে যারা জড়িত তারা বহু ব্যয় করে সংবাদপত্রে পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন দিয়ে, টেলিভিশনে টাইম স্লট কিনে, কিংবা বহু টাকা খরচ করে ভোটারদের মনভোলানো উপহার ঘুষ দিয়ে প্রচার চালায় এবং চালাতে পারে। তাদের বিশেষ কোন অসুবিধা হবে না। বরং গণআন্দোলনের শক্তি সংগ্রামী রাজনৈতিক দল, বিশেষত এস ইউ সি আই, যে দল পুরোপুরি গরিব-মধ্যবিত্ত জনগণের দেওয়া বিন্দু বিন্দু অর্থের উপর নির্ভর করে নির্বাচনে লড়ে, নির্বাচনী প্রচারে সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলি তুলে ধরে এবং সংসদীয় ব্যবস্থার শ্রেণীচরিত্র তুলে ধরে জনতাকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে — তারা প্রচার করতে না পারায় শাসকদল বা ভোটসর্বস্ব বিরোধী দলের বাড়তি সুবিধা হয়ে যাবে। রাজনীতিক্ষেত্রে টাকার থলির অধিকারী মালিকশ্রেণীর দলের বিরুদ্ধে গরিব মানুষের দলকে যে অসম প্রতিযোগিতা করতে হয়, এই নিষেধাজ্ঞা তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে।

ধনীনির্ধন মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অবাধ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দেশের শাসনক্ষমতা কাদের হাতে থাকবে তা ঠিক করার যে অধিকার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বীকৃত, দীর্ঘদিন আগে থেকেই সেই অধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এমনিতেই নানা কারচুপি, জালিয়াতি, প্রশাসন-পুলিশ-সমাজবিরোধীদের যোগসাজসে বুথ দখল, ছাপ্পা ভোট, সন্ত্রাস প্রভৃতির মধ্য দিয়ে নির্বাচনকে কার্যত প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে, তার ওপর নির্বাচনকে ক্রমশ ব্যয়বহুল করে দিয়ে গণআন্দোলনের শক্তির পক্ষে নির্বাচনে প্রার্থী দাঁড় করানো এবং জনসাধারণের সামনে তাদের বক্তব্য উপস্থিত করার পথ কার্যত বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। ফলে, শাসকদল বা বিরোধী ভূমিকায় থাকা চিহ্নিত বুর্জোয়া দল, অর্থাৎ, বিজেপি বা কংগ্রেস এবং এন ডি এ বা ইউ পি এ'র শরিক দল বা সিপিএম-সিপিআই'র মত সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক দল — যারা বামপন্থার নামাবলী গায়ে দিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থই রক্ষা করে — এদের মধ্যেই নির্বাচন সীমাবদ্ধ থাকবে। এদেরই এক পক্ষ ক্ষমতায় গিয়ে মালিকশ্রেণীর স্বার্থে শাসন চালাবে, অপর পক্ষ বিরোধী আসনে বসবে। বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থার মধ্যে জনস্বার্থ এবং গণআন্দোলনের কণ্ঠস্বর প্রতিফলিত করার যতটুকু সুযোগ ছিল — বাস্তবে তাও আর থাকবে না। ফলে বাইরের গণআন্দোলন এবং সংসদের ভিতরে সেই আন্দোলনের কণ্ঠস্বর পৌঁছে দেওয়া, সরকারের প্রতিটি জনবিরোধী নীতির মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে তার আসল চরিত্র জনগণের সামনে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে গণআন্দোলনকে তীব্রতর করার সুযোগ সঙ্কুচিত হবে।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, বুর্জোয়া ব্যবস্থার সঙ্কট যত বাড়ছে, ততই শাসকগোষ্ঠী বেশি বেশি করে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি খর্ব করছে। '৭৬ সালে কেন্দ্রে ইন্দিরা কংগ্রেসের শাসনে, নগ্ন ফ্যাসিবাদী পদক্ষেপ হিসাবে জরুরি অবস্থা জারির সময়ে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, দেশব্যাপী প্রেস সেন্সরশিপের বাতাবরণে এ রাজ্যে বিরোধী কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করতে দেওয়াল লিখন ও পোস্টারিং বন্ধে আইন এনেছিলেন। '৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর, যথার্থই বামপন্থী দল হলে, সিপিএমের অবশ্যই উচিত ছিল জরুরি অবস্থার সময় কংগ্রেসের আনা এই কালাকানুন বাতিল করা। কিন্তু তা তারা করেনি। কেন করেনি? কারণ বামপন্থী রাজনীতি ছেড়ে মালিকশ্রেণীর স্বার্থ দেখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিপিএম, ভবিষ্যতের রক্ষাকবচ হিসাবে এই কালাকানুন জিইয়ে রেখেছিল। ক্ষমতায় বসে তারা যদি এই আইন বাতিল করত, তবে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে নিষেধাজ্ঞা জারি করা এত সহজ হত না।

কাজেই একথা পরিষ্কার যে, দেশের মানুষকে ঠকাতে বাইরে নির্বাচন কমিশনের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে মুখে উষ্মা প্রকাশ করলেও, বুর্জোয়া স্বার্থের পরিপূরক হিসাবে তারাও নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্যে গণতন্ত্রের রেশ যেতে যেতে এখনও যতটুকু টিকে আছে তাকেও মেরে দিতে চাইছে। কিছুদিন আগে সিপিএম মিছিলের অধিকার রক্ষার নামে যতটুকু লোকদেখানো বালতি হাতে ভিক্ষায় নেমে জঙ্গি সেজেছিল, এবারে সেই রাস্তাতেও তারা হাঁটেনি, পাছে শাসকশ্রেণীর কাছে কোনও ভুল সঙ্কেত পৌঁছায়। বরং এবারে সিপিএম নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে চলবে শুধু এইটুকু ঘোষণাই নয়, তাদের পরিচালিত ফ্রন্ট সরকার পুলিশ-প্রশাসনের সহযোগিতায় নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে আগ বাড়িয়ে মাঠে নেমে পড়েছে। এমনিতেই প্রার্থীর জামানত ২৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০০০ টাকা করা, কেবল কাউন্টিং এজেন্ট নয়, পোলিং এজেন্টদেরও ফটো জমা দেওয়া প্রভৃতি নিত্যনূতন আদেশে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার খরচ বাড়ানো হচ্ছে। দেওয়াল লিখন এবং পোস্টারিং-এও নিষেধাজ্ঞা জারি করে প্রচারের খরচ বিপুল পরিমাণে বাড়িয়ে দেওয়া হল, যা গরিব দলের নাগালের বাইরে। এইভাবে গোটা নির্বাচনী প্রক্রিয়াটাকে তারা ধনীদের কুক্ষিগত করে ফেলেছে।

শহর সুন্দর করার বুলি অজুহাত মাত্র

ওয়ালিং-পোস্টারিংয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার পিছনে কংগ্রেসের মতো সিপিএমও শহর সুন্দর করার যে যুক্তি তুলছে তা নেহাতই অজুহাত। শহর সুন্দর করার উদ্দেশ্য থাকলে সরকার আগে শহরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, জঞ্জালের স্তূপ দূর করত, নিকাশি ব্যবস্থার সংস্কার করত, শহরের গরিব এলাকাগুলি মনুষ্যবাসের যোগ্য করত — কিন্তু সেদিন কংগ্রেস বা বর্তমানে সিপিএম সে চেষ্টা আদৌ করেনি। মশামাছির উপদ্রবে রাজ্যের সর্বত্র এমনকী কলকাতা শহরেও কলেরা, জন্ডিস, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু ঘুরে ঘুরে মহামারী আকারে আসে। শহরের ফুটপাথে হাজার হাজার নিঃস্ব মানুষের সংসার, হাজার হাজার পথশিশু পথেই জন্মায়, পথেই মরে। যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সভ্যতার নামে, উন্নয়নের নামে মানুষকে পথের কুকুরের সাথে আঁস্তাকুড়ে টেনে নামিয়েছে, মা-বোনেদের রাজপথের ধারে দাঁড় করিয়েছে দেহ বেচতে — তার আবার সৌন্দর্য কী ! দেশের যুবশক্তিকে বিপথে চালাতে যে সরকার ঢালাও

সাতের পাতায় দেখুন

পার্টি সদস্যের জীবনাবসান

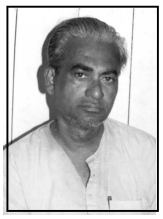

এস ইউ সি আই এবং ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর প্রবীণ সদস্য কমরেড কমল বসাক স্বল্পকালীন অসুস্থতার পর অকস্মাৎ গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ৬১ বছর বয়সে শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

জগদ্দল শিল্পাঞ্চলের অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান কমরেড কমল বসাক ষাটের দশকের প্রথম দিকে, ঐ এলাকার পার্টি সংগঠক কমরেড রতন ভৌমিকের মাধ্যমে এস ইউ সি আই দলের সাথে নিজেকে যুক্ত করেন। প্রথম জীবনে তিনি বিড়ি শ্রমিকের কাজ করতেন, পরে জগদ্দল চটকলে শ্রমিকের কাজে নিযুক্ত হন। দলের একনিষ্ঠ কর্মীরূপে তিনি সর্বদা পার্টির দেওয়া যেকোন দায়িত্ব হাসিমুখে পালন করেছেন। কোন কাজকেই তিনি ছোট মনে করতেন না। তিনি ছাত্রকর্মী, শ্রমিককর্মী সকলের সাথেই আনন্দের সঙ্গে কাজ করতে পারতেন। অবসর জীবনেও তিনি দিনের বেশিরভাগ সময় কাটাতেন শ্রমিকদের মধ্যেই। তাঁর প্রসন্ন স্বভাব ও অনাড়ম্বর জীবনের জন্য তিনি সকলেরই অত্যন্ত প্রিয়জন ছিলেন। তাঁর এই অকস্মাৎ মৃত্যু পরিচিতদের কাছে গভীর শোকের কারণ হয়।

৪ মার্চ ভাটপাড়া এস ইউ সি আই অফিসে প্রয়াত কমরেডের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সদানন্দ বাগল, বর্ষীয়ান ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কমরেড কমল ভট্টাচার্য, দলের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অমল সেন ও লোকাল কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড রতন ভৌমিক বক্তব্য রাখেন। সভা পরিচালনা করেন কমরেড ইন্দ্রানী হালদার।

সিপিএম সরকারের ৩০ বছরে কৃষির হাল

গ্রামীণ খেতমজুর

রাজ্য সরকারের মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০০৪ অনুযায়ী

খেতমজুর —	৭৩.৬২ লক্ষ
উৎখাত হওয়া পাট্টাদার —	৩.৬৩ লক্ষ
উৎখাত হওয়া বর্গাদার —	২.১৭ লক্ষ
মোট	৭৯.৪২ লক্ষ

অর্থাৎ জমি ও জীবিকা হারানো মানুষ প্রায় ৮০ লক্ষ। প্রতি পরিবারে ৫ জন করে ধরলে (৮০×৫) ৪ কোটি অর্থাৎ পশ্চিমবাংলায় ৫০% মানুষ অনাহারের পথে। খেতমজুররা কাজ পায় বছরে ১১৪ দিন। অর্থাৎ ২৫১ দিন তাদের নিশ্চিত কাজ নেই।

কৃষক জমি হারাচ্ছে

১৯৮৭-'৮৮ আর্থিক বছরে গ্রামীণ ভূমিহীন পরিবার	৩৯.৬ শতাংশ
১৯৯৯-২০০০ আর্থিক বছরে গ্রামীণ ভূমিহীন পরিবার	৪৯.৮ শতাংশ

ক্রমাগত অধিকতর সংখ্যায় কৃষক জমি হারিয়ে ভূমিহীন হচ্ছে।

কৃষি উৎপাদনে সত্যিই কি পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে?

২০০৩-'০৪ সালের হিসাব অনুযায়ী, ভারতের মোট খাদ্যশস্য উৎপাদনে —

পশ্চিমবঙ্গের উৎপাদন	৭%	(চতুর্থ)
রাজস্থানের উৎপাদন	৮.৫১%	
পাঞ্জাবের উৎপাদন	১১.৬৩%	
উত্তরপ্রদেশের উৎপাদন	২০.৮৩%	

পশ্চিমবঙ্গ কেবল চাল উৎপাদনে		প্রথম
আলু	,,	দ্বিতীয়
গম	,,	প্রথম তিনের মধ্যে পঃবঃ নেই
তৈলবীজ	,, ,, ,, ,, ,, ,,	
ডাল	,, ,, ,, ,, ,, ,,	
আখ	,, ,, ,, ,, ,, ,,	

পশ্চিমবঙ্গে হেক্টর প্রতি চাল উৎপাদন — ২,৪৬৩ কিলোগ্রাম

তামিলনাড়ুতে	,,	,,	,, — ৩,৩৫০	,,
হরিয়ানায়	,,	,,	,, — ২,৭২৪	,,
পাঞ্জাবে	,,	,,	,, — ৩,৫১০	,,
অন্ধ্রপ্রদেশে	,,	,,	,, — ২,৬২১	,,

(বর্তমান ১৭-১২-০৫)

পশ্চিমবঙ্গ আমদানি করে

অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আমদানি করে মাছ

পাঞ্জাব থেকে আমদানি করে গম (বর্তমান ৩০-৮-০৫)

২০০৩-০৪ আর্থিক বছরে রাজ্য কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার থেকে ২৫ লক্ষ ৪২ হাজার টন খাদ্যশস্য সংগ্রহ করেছিল। (আনন্দবাজার পত্রিকা ১৫-৯-০৫)

অ্যাবেকার ৫ম মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলন

গত ৭-৮ মার্চ সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির ৫ম মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৭ মার্চ বহরমপুর গ্র্যান্ট হল ময়দানে বিকাল ৪টায় প্রকাশ্য সমাবেশ হয়। লালগোলা, ভগবানগোলা, ডোমকল, ইসলামপুর, হরিহরপাড়া, দৌলতাবাদ, বেলডাঙ্গা, কান্দী, জঙ্গীপুর ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি গ্রুপ সাপ্লাই থেকে সহস্রাধিক বিদ্যুৎগ্রাহক, যাদের অধিকাংশই কৃষি-বিদ্যুৎগ্রাহক, মিছিল করে সমাবেশে যোগদান করেন। বহরমপুর শহরের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলা সভাপতি বাণী ইস্রাইল। দেওয়াল লিখন বন্ধের বিরুদ্ধে এবং গণআন্দোলনে পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে ২টি প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হয়। জেলা সম্পাদক কুণাল বিশ্বাস সভায় বক্তব্য রাখেন। প্রধান বক্তা ছিলেন গ্রাহক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস। প্রকাশ্য সভার পর ঐ দিনই বহরমপুর কালেক্টরেট ক্লাব হলে দু'দিনব্যাপী প্রতিনিধি সম্মেলন শুরু হয়। সমাপ্তি অধিবেশনে বাণী ইস্রাইলকে সভাপতি ও কুণাল বিশ্বাসকে সম্পাদক পুনঃনির্বাচিত করে নতুন জেলা কমিটি গঠিত হয়। সভায় উপস্থিত আমরণ অনশনে অংশগ্রহণকারীদের সংবর্ধনা জানানো হয়।

ফ্রান্সে ছাত্রবিক্ষোভ

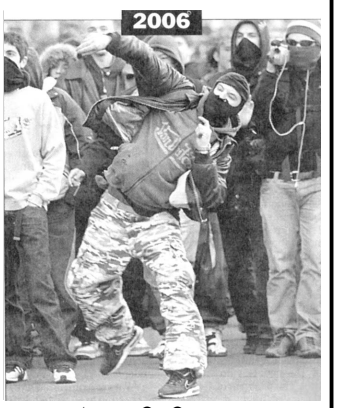

নয়া শ্রম আইনে চাকরির নিরাপত্তা কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদে লক্ষ লক্ষ ছাত্র ও শ্রমিক রাস্তায় নেমেছেন, রবিবার (১৯ মার্চ) ১৫০টি মিছিল বের হয়। পুলিশের দিকে ঢিল ছুঁড়ছেন এক ছাত্র বিক্ষোভকারী।

নদীয়ায় শ্রমিক কর্মচারীদের বিক্ষোভ সমাবেশ

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহ্বানে সপ্তাহব্যাপী শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতিবাদের অঙ্গ হিসাবে গত ২০ ফেব্রুয়ারি নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে শ্রমিক-কর্মচারীদের বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। জেলার বিভিন্নপ্রান্তের বিড়ি ও নির্মাণ শ্রমিক, রিক্সাচালক, পরিচারিকা সহ অসংগঠিত শিল্পের বিভিন্ন পেশার শ্রমিক-কর্মচারীরা ক্ষৌণীশ পার্ক থেকে মিছিল করে জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে এলে পুলিশ তাদের গতিরোধ করে। সেখানেই শুরু হয় বিক্ষোভ সভা। সভার শুরুতে জেলা সম্পাদক কমরেড প্রবীর দে সংগঠিত ও অসংগঠিত শিল্প শ্রমিকদের সমস্যাগুলি তুলে ধরে ১১ দফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি পাঠ করেন। সভায় ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সুজিত ভট্টশালী বলেন, পুঁজিপতিশ্রেণীর তল্পিবাহক কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার শ্রমজীবী মানুষের উপর ক্রমাগত আক্রমণ নামিয়ে আনছে। শ্রম আইন সংশোধনের নামে শ্রমিকের অর্জিত অধিকার খর্ব করছে। ফলে ৮ ঘণ্টার পরিবর্তে ১২/১৪ ঘণ্টা কাজ করানো, ২০/২৫ টাকা মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য করানো, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা আত্মসাৎ, সুদের হার কমানো, বেসরকারীকরণ, অবাধ ছাঁটাই-লকআউট-ক্লোজার ইত্যাদি ঘটতে পারছে। ১০০ দিনের কাজ, সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণমূলক প্রকল্পের সরকারি ঘোষণা কেবলমাত্র ভোটের চমক। এসবের বিরুদ্ধে চাই প্রতিরোধ আন্দোলন। সিআইটিইউ-আইএনটিইউসি প্রভৃতি শ্রমিক সংগঠনের আপসমুখিতা শ্রমিক আন্দোলনকে দুর্বল করছে। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী একক উদ্যোগেই আজ আন্দোলনে নেমেছে। এজন্য তিনি শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের হাতিয়ার সংগ্রাম কমিটি গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এছাড়া বক্তব্য রাখেন জেলা সভাপতি কমরেড কেষ্ট চৌধুরী। কমরেড প্রবীর দে'র নেতৃত্বে পাঁচজনের প্রতিনিধি দল অতিরিক্ত জেলা শাসকের (সাধারণ) সাথে দেখা করে স্মারকলিপি তুলে দেন।

রাজনৈতিক প্রচারে নিষেধাজ্ঞা

ছয়ের পাতার পর

মদের দোকান আর অনলাইন লটারির লাইসেন্স দিচ্ছে — তার মুখে সৌন্দর্যের বাণী বেমানান।

ব্যবসায়িক পণ্যের হোর্ডিংয়ে শহরের আকাশ ঢাকা, যা প্রায়শই অশ্লীল — এতে শহর অসুন্দর হয় না ? লক্ষ লক্ষ গরিব যে দেশে ক্ষুধিত শিশুর মুখে একমুঠো ভাত দিতে পারে না, সেই দেশে মুষ্টিমেয়র নির্লজ্জ বিলাসের জন্য পাঁচতারা হোটেলের নৈশ আসরে ছোটে মদের ফোয়ারা — এর চেয়ে বীভৎস, এর চেয়ে অসুন্দর আর কী হতে পারে? এসব থাকাটা অসুন্দর নয়, অথচ এর বিরুদ্ধে দেওয়াল লেখা এবং এর বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সংগ্রামী প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারের অঙ্গ হিসাবে দেওয়াল লেখা অসুন্দর? অন্যায়টা অসুন্দর নয়, অন্যায়ের প্রতিবাদের প্রকাশটা অসুন্দর — এইটা বোঝাতে চাইছে কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম। লজ্জার কথা, সিপিএম নেতৃত্ব আজ সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের প্রসাদে উন্নয়নের চশমা পরে কংগ্রেস-বিজেপি'র মতোই গরিব মানুষকে জঞ্জাল হিসাবে এবং গরিবের প্রতিবাদ ও বাঁচার দাবিকে উৎপাত হিসাবেই দেখছে। দেশিবিদেশি মালিকদের চোখে যা সুন্দর সেইভাবে শহরকে, পারলে গোটা দেশকে সাজাতে চাইছে। দেওয়াল লিখন ও পোস্টারিং বন্ধ করার মধ্য দিয়ে নির্বাচনকে ধনীর মদতপুষ্ট দলগুলির কুক্ষিগত করার বুর্জোয়া অপচেষ্টা — যে অপচেষ্টায় কংগ্রেস-বিজেপির পাশে সিপিএমও শরিক — তাকে যে কোন মূল্যে রুখতে না পারলে শোষিত মানুষের সর্বনাশ।

লক্ষণীয়, একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই দেশের মধ্যে সর্বপ্রথম এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করছে সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার। বলাবাহুল্য মিছিল-মিটিং-নিয়ন্ত্রণ, শিল্পে-কলে-কারখানায় ধর্মঘট না করা — এক কথায় মালিকশ্রেণী যা যা চায় তা কার্যকরী করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিচ্ছে সিপিএম। এজন্য মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু এদেশের মালিকশ্রেণী তো বটেই, এমনকী সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন পুঁজিপতিদেরও নয়নের মণি। তাঁর কর্মদক্ষতা ও বাস্তব জ্ঞানের সার্টিফিকেট দিচ্ছেন মার্কিন প্রশাসনের কর্তা জর্জ মালফোর্ড। একজন বামপন্থীর পক্ষে এর চেয়ে লজ্জার আর কী আছে! প্রকৃতপক্ষে মালিকশ্রেণীর স্বার্থে কংগ্রেস, বিজেপি এবং তার জোট শরিক তৃণমূল যা করতে চেয়েছে, কিন্তু গণবিক্ষোভের ভয়ে করতে পারেনি — সেটাই সিপিএম মসৃণভাবে করে দিতে চলেছে।

কিন্তু জনসাধারণকে বুঝতে হবে, একমাত্র সচেতন সংগঠিত গণআন্দোলনই শোষিত মানুষের বাঁচার একমাত্র পথ। যদি প্রচার করার, জনমত সংগঠিত করার এবং গণআন্দোলন গড়ে তোলার পরিবেশ ও সুযোগ দেশে ধ্বংস হয়ে যায় তবে পুঁজিবাদী শোষণের যাঁতাকলে অসহায়ভাবে তিলে তিলে মানুষকে মরতে হবে। একথা ঠিক যে, নীতিহীন সংসদীয় দলগুলি মিটিং-মিছিলের গণতান্ত্রিক অধিকারকে সঙ্কীর্ণ দলীয় ও ব্যক্তিস্বার্থে কাজে লাগিয়েছে। তাদের এই নীতিহীন সঙ্কীর্ণতা ও গদিসর্বস্ব রাজনীতিতে জনগণের ক্ষোভের যথেষ্ট কারণও আছে। আবার একথাও ঠিক, একেই কাজে লাগিয়ে শাসকশ্রেণী আন্দোলনের অধিকারকেই আজ কেড়ে নিতে চাইছে। জনগণ যদি ক্ষোভ থেকে পরিচালিত হয়ে বাক্‌স্বাধীনতার প্রসারিত অঙ্গ মিটিং-মিছিল, দেওয়াল লিখন, ব্যানার-পোস্টারের ওপর নিয়ন্ত্রণ বিধি বা নিষেধাজ্ঞাকে সমর্থন করেন, তাহলে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারা হবে। জনগণের কর্তব্য হবে, বহু সংগ্রামের দ্বারা অর্জিত এই অধিকারগুলি জীবন দিয়ে রক্ষা করা এবং যে সমস্ত দল সঙ্কীর্ণ দলীয় বা ব্যক্তিস্বার্থে এই অধিকারগুলি অপপ্রয়োগ করেছে তাদের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যে সমস্ত দল এই গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি অপপ্রয়োগ করেছে বা সঙ্কীর্ণ স্বার্থে একে ব্যবহার করছে তারাই কিন্তু ক্ষমতায় বসে এই অধিকারগুলি কেড়ে নিতে তৎপর। সবটাই তারা করছে এদেশের ও বিদেশের একচেটিয়া মালিকদের স্বার্থে। তাই সমস্ত রকমের বিভ্রান্তি কাটিয়ে জনগণকে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। এদেশের বিশেষ পরিবেশে ঐতিহাসিকভাবে গড়ে ওঠা গণতন্ত্রসম্মত রীতি দেওয়াল লিখন, পোস্টার-ব্যানার লাগানো, মিটিং-মিছিল বন্ধ করার মালিকী চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। দীর্ঘ রক্তক্ষয়ের দ্বারা অর্জিত অধিকার রক্ত দিয়েই রক্ষা করতে হবে।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

রেল ও সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘট পিছিয়ে দেওয়া হল কেন

শ্রমিক কর্মচারীদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনকে অঙ্কুরেই শেষ করে দেওয়া হল। বিমান কর্মচারীরা দৃঢ় মনোবল নিয়ে আন্দোলনে নেমে পড়লেও এবং রাষ্ট্রের দমনশক্তি পুলিশ ও সিআরপিএফের আক্রমণের মোকাবিলা করে ৯৬ ঘণ্টাব্যাপী ধর্মঘট চালিয়ে গেলেও আন্দোলনের প্রশ্নে দ্বিধাগ্রস্ত-দোদুল্যমান নেতৃত্ব কার্যত কোন দাবি আদায় ছাড়াই কিছু শুকনো আশ্বাসের ভিত্তিতে গত ৪ ফেব্রুয়ারি আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। অন্যদিকে রেল, প্রতিরক্ষা, ডাক সহ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা তাদের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধানের দাবিতে বহু আন্দোলন করেও অনন্যোপায় হয়ে যখন ১ মার্চ থেকে অনির্দিষ্টকালীন ধর্মঘটের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখনও দেখা গেল দোদুল্যমান নেতৃত্ব মূল দাবিগুলি নিয়ে কোন আলোচনা ছাড়াই কিছু মৌখিক আশ্বাসের ভিত্তিতেই ধর্মঘট দু'মাসের জন্য স্থগিত করে দিলেন। শুধু এবারই নয়, ১৯৭৪ সালের ঐতিহাসিক রেলধর্মঘট, যা বিরাট ব্যাপ্তি নিয়ে গড়ে উঠেছিল, যার মোকাবিলায় তৎকালীন ইন্দিরা কংগ্রেস সরকার শুধু রাষ্ট্রীয়বাহিনী দিয়েই নয়, গুণ্ডাবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে, প্রসটিটিউটদের কাজে লাগিয়ে আন্দোলনে সামিল মহিলাদের উপর পাশবিক অত্যাচার নামিয়ে এনেছিল; সেই ঐতিহাসিক আন্দোলনও কোন দাবি আদায় ছাড়াই প্রত্যাহার করে নিয়ে নেতৃত্ব শ্রমিক আন্দোলনে জল ঢেলে দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়েও ডাক ও টেলিগ্রাফ (P&T) বিভাগের কর্মচারীদের সর্বভারতীয় ধর্মঘট, ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ধর্মঘটও শুরু হওয়ার আগেই প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় শুধু সমস্যা থাকলেই এবং সমস্যা থেকে মুক্তির আকুতি থাকলেই লড়াই হয় না, লড়াইয়ের জন্য প্রয়োজন সঠিক আদর্শ ও তাকে ভিত্তি করে সংগ্রামী যোগ্য নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণীর আবেগময় অংশগ্রহণ।

১ মার্চ থেকে ডাকা অনির্দিষ্টকালীন ধর্মঘটের নেতৃত্বে ছিল জয়েন্ট কাউন্সিল অব অ্যাকশন বা জেসিএ। কাদের নিয়ে গঠিত হয়েছে জেসিএ? কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের যে সমস্ত সংগঠন ধর্মঘট এড়ানোর ঘোষিত উদ্দেশ্যে এবং আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য গঠিত জেসিএম (জয়েন্ট কনসালটেটিভ মেশিনারি)-এর অন্তর্ভুক্ত, তাদের নিয়ে গঠিত হয়েছে জেসিএ। এই জেসিএ নেতৃত্ব, ধর্মঘট এড়িয়ে যাওয়াই যার স্বাভাবিক প্রবণতা, সেই নেতৃত্বও যখন ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল এবং ধর্মঘটের পক্ষে দেওয়াল লিখন-পোস্টারিং-মিছিল-মিটিং, ছোট বড় সভার আয়োজন করছিল তখন একথা সহজেই বোঝা যায় যে শ্রমিক কর্মচারীরা জোরালোভাবেই ধর্মঘট চাইছিলেন যা নেতৃত্ব উপেক্ষা করতে পারেননি। ধর্মঘটের আগে স্ট্রাইক ব্যালটে ধর্মঘটের পক্ষে ৯৬ শতাংশ রেল কর্মচারী রায় দিয়েছিলেন। ৭ ফেব্রুয়ারি যখন ধর্মঘটের নোটিশ দেওয়া হয় তখন কর্মচারীদের মধ্যে খুবই উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু নোটিশ দেওয়ার ৮ দিনের মধ্যেই ধর্মঘট প্রত্যাহার সাধারণ কর্মচারীদের হতোদ্যম করেছে, হতাশ করেছে। যে মূল দাবিগুলিতে ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল তা নিয়ে কোন কথাই হল না, কেবল ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠনের সরকারি আশ্বাসের ভিত্তিতেই ধর্মঘট তুলে নেওয়া হল।

ধর্মঘটের ডাক দেওয়ার সময় জে সি এ নেতৃত্ব ২০ দফা দাবি সংবলিত যে সনদ প্রকাশ করেছে তাতে ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন গঠন, ৫০ শতাংশ ডি এ মূল বেতনের সঙ্গে সংযুক্তি, নতুন পেনশন স্কীম বাতিল, প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুদের হার বৃদ্ধি, কর্মসঙ্কোচনমূলক বিভিন্ন স্কীম বাতিল প্রভৃতি দাবিসহ আরও কিছু দাবি ছিল। কিন্তু এটা লক্ষণীয় যে, জেসিএ নেতৃবৃন্দের স্বাক্ষরিত দাবিপত্রে বেসরকারীকরণ, নিগমীকরণ প্রভৃতি — যার কারণে কর্মী ও কর্মসঙ্কোচন ঘটছে — তার বিরুদ্ধে কোন দাবি বা কথা ছিল না। ধর্মঘটের নোটিশেও বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে কোন দাবি ছিল না। অথচ বেসরকারীকরণই রেল শিল্পে বড় আক্রমণ। ইতিমধ্যে বহু কাজ বেসরকারি হাতে চলে গেছে। সাফাই, কিচেন, ক্যাটারিং, মেন্‌টেন্যান্স, সিগনালিং প্রভৃতিতে অপ্রতিহত গতিতে বেসরকারীকরণ হয়ে চলেছে। বেসরকারি মালগাড়ি চালানোর টেন্ডার নেওয়া হয়েছে। এর বিরুদ্ধে জেসিএ'র কোন প্রতিবাদ ছিল না। তেমনি ঐ দাবিপত্রে ধর্মঘটের অধিকার সংক্রান্ত কোন দাবি ছিল না। এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ দাবিকে জেসিএ নেতৃত্ব সচেতনভাবে এড়িয়ে গেলেন কেন? কেনই বা এই ধর্মঘটকে শুধুমাত্র কর্মচারীদের কিছু অর্থনৈতিক দাবি দাওয়ার স্তরেই সীমাবদ্ধ রাখলেন — এই প্রশ্নের উত্তর জেসিএ নেতৃত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না।

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠনের যে আশ্বাস দিয়েছেন, কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আই এন টি ইউ সি অনুমোদিত রেল কর্মচারী সংগঠন এন এফ আই আর তাকে বিশাল জয় হিসাবে ঘোষণা করেছে এবং সপ্তাহব্যাপী বিজয় উৎসব পালনের নির্দেশ দিয়েছে। কী সেই জয়? ধর্মঘট পিছিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে প্রকাশিত প্রচারপত্রে জেসিএ নেতৃত্ব বলেছেন, পঞ্চম বেতন কমিশনে গৃহীত বেতন নির্ধারণ সূত্র অনুযায়ী বেতন ধার্য করার সিদ্ধান্তে তাঁরা খুশি। পঞ্চম বেতন কমিশনের সেই ফর্মুলাটি কী? সেখানে বলা হয়েছে গ্রুপ এ বা ঊর্ধ্বতন অফিসারদের বেতন নির্ধারিত হবে তাদের ন্যায়সঙ্গত (!) মাসিক খরচ অনুযায়ী। কিন্তু গ্রুপ বি, সি বা ডি'র ক্ষেত্রে বেতন নির্ধারিত হবে যত শতাংশ নীট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে তার ওপর। বেতনবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই দুই ধরনের বৈষম্যমূলক নীতিকে কংগ্রেস সমর্থক শ্রমিক নেতারা বিরাট জয় হিসাবে দেখিয়ে তৃপ্তিবোধ করছেন। অথচ কে না জানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার শ্রমিকের নেই। এই সিদ্ধান্ত একমাত্র মালিক নেয়। মালিকরাই ঠিক করে কখন উৎপাদন বাড়ানো হবে, কখন কমানো হবে। মালিক মুনাফার হিসাব করে উৎপাদন কখনও বাড়ায় কখনো কমায়। মালিক না চাইলে এবং বাজার না থাকলে শ্রমিকরা হাজার চেষ্টা করেও উৎপাদন বাড়াতে পারে না। অথচ উৎপাদন কমের অজুহাতে শ্রমিকদের বেতন কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উৎপাদন হ্রাসের কারণ, হয় উচ্চতর কর্তৃপক্ষের অযোগ্যতা, নয়ত পুঁজিপতির মুনাফার স্বার্থ। এখন কংগ্রেস সরকার পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্কটের বোঝা শ্রমিকদের উপর কৌশলে চাপিয়ে দিল। কোন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সচেতন শ্রমিক এই বৈষম্যবাদী বেতননীতি মেনে নিতে পারে না। ইন্ডিয়ান লেবার কনফারেন্স ১৯৫৭ সালে ন্যূনতম বেতন নির্ধারণের যে নীতি ঘোষণা করেছিল, তারপরে মূল্যবৃদ্ধি বিপুল পরিমাণে ঘটলেও, পঞ্চম বেতন কমিশন অনুযায়ী বেতন তার চেয়ে অনেক কমে যায়। জে সি এ নেতৃত্ব শ্রমিক কর্মচারীদের উপর উদ্যত এই আক্রমণের বিরুদ্ধে আন্দোলন না করে তাদের আক্রমণের মুখে ঠেলে দিলেন।

দ্বিতীয়ত, সরকার বলেছে ডাউন সাইজিং, পোস্টসারেন্ডারিং, আউটসোর্সিং বা কর্মী নিয়োগ বন্ধ করার আগে ক্যাবিনেট মন্ত্রী 'স্টাফ সাইড' অর্থাৎ ইউনিয়নের সাথে কথা বলবেন। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা হল ইউনিয়নের কোন আপত্তিই প্রশাসন শুনছে না। অথচ 'ইউনিয়নের সাথে কথা বলেই সরকার সব করছে' একথা বলে প্রশাসনের সমস্ত অপকর্মের দায়ভার ইউনিয়নের ঘাড়ে চাপানোর রাস্তা তৈরি করা হল। জে সি এ নেতৃত্ব এটাকেই সাফল্য বলছেন।

তৃতীয়ত, চুক্তি হয়েছে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের প্রমোশন দেখভাল করার জন্য একজন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজারকে শীর্ষে রেখে একটি কমিটি করা হবে। এই জেনারেল ম্যানেজারদের সম্পর্কে যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁরা জানেন, জেনারেল ম্যানেজাররা হাজার হাজার চতুর্থ শ্রেণীর পদ বিলুপ্ত করে সেই কাজ ঠিকাদারদের হাতে তুলে দেওয়ার পুরস্কার হিসাবে প্রমোশন পেয়েছেন। কর্মজীবনে যিনি চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলেছেন তাঁর কাছে চতুর্থশ্রেণীর কর্মচারীরা সুবিচার আদৌ আশা করতে পারেন কি ?

ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠনের যে প্রতিশ্রুতি, ধর্মঘটের হুমকির সামনে পড়ে কেন্দ্রীয় সরকার দিতে বাধ্য হয়েছে তাকে বাস্তবায়িত করতে হলেও জোরদার শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। তাছাড়া যে মূল সমস্যাগুলি রেল শিল্পের এবং রেল কর্মচারীদের সর্বনাশ ডেকে নিয়ে আসছে, যেমন বেসরকারীকরণ, কর্মীসঙ্কোচন, আউটসোর্সিং, ডাউনসাইজিং, স্পেশাল ভলান্টারি রিটায়ারমেন্ট স্কীম, নতুন পেনশন নীতি, চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ, স্থায়ী নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা — এগুলি পরিবর্তনে সরকার কোন পদক্ষেপ নেয়নি, উপরন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কার কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এই বিপদ ক্রমাগত বাড়ছে। সেই কারণে আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি করে দেখা দিয়েছে। আন্দোলনের চাপ না থাকলে সরকার কোন প্রতিশ্রুতিই রক্ষা করে না। সরকার শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি দরদী হলে ২০০৩ সালেই বেতন কমিশন গঠিত হয়ে যেত। জে সি এ নেতৃত্বের দ্বিধাগ্রস্ততা আন্দোলনের সামনে একটা বড় বাধা হিসাবে কাজ করছে।

জে সি এ নেতৃত্ব ধর্মঘটের ঘোষণা করার আগে শ্রমিক কর্মচারীদের মতামত নিলেও, ধর্মঘট প্রত্যাহার করার প্রশ্নে তাঁদের মতামত নেওয়ার কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। অথচ কর্মচারীরা সমস্যা সমাধানের আশায় ধর্মঘটের পক্ষেই রায় দিয়েছিলেন। শ্রমিকদের মতামত উপেক্ষা করে যেভাবে আন্দোলন প্রত্যাহার করা হচ্ছে বা আন্দোলন শুরুই করা হচ্ছে না — তা বন্ধ না হলে আগামী দিনে শ্রমিকদের উপর আরও আক্রমণ নেমে আসবে। শ্রমিক আন্দোলনের সামনে থেকে এই আপসমুখী, আন্দোলনবিমুখ, দোদুল্যমান নেতৃত্বকে অপসারিত করে সংগ্রামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করাই আজ শ্রমিক আন্দোলনে জরুরি প্রয়োজন হিসাবে দেখা দিয়েছে।

এই ধর্মঘটের প্রশ্নে সিপিএম, সিপিআই নেতৃত্বের ভূমিকা কোন অংশে কম নিন্দনীয় নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ সিপিএম ও তার সহযোগী বাম দলগুলি। তাদের সমর্থনের উপরই এই সরকার টিকে আছে। তারা আন্তরিকভাবে চাইলে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবিদাওয়া মেনে নেওয়ার জন্য সরকারের ওপর অন্তত চাপ সৃষ্টি করতে পারত। সেসব তারা কিছুই করেনি। সিটু নেতৃত্বও আন্দোলনে মূলত বেতন কমিশনের উপরই জোর দিয়েছেন। মূল দাবিগুলির প্রশ্নে তাঁরাও গুরুত্ব আরোপ করেননি। কারণ সিপিএম, সিপিআই যে সমস্ত রাজ্যে ক্ষমতাসীন সেখানে তারাও বেসরকারীকরণ করে চলেছে।

নানা কারণে এই আন্দোলনে বিভিন্ন শক্তি এলেও এই আন্দোলনের মধ্যে যে শক্তি যথার্থই আন্দোলনকে সফল পরিণতিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী এবং সংগ্রামে সাহসী, দৃঢ় শুধু নয় শ্রমিক শ্রেণীর উপর নেমে আসা আক্রমণের চরিত্র যে প্রাঞ্জলভাবে দেখাতে পারে এবং জানে মজুরি দাসত্ব থেকে শ্রমিকের মুক্তি কোন্ পথে, তাকে চিনে নিয়ে সেই নেতৃত্বের শক্তিবৃদ্ধি করাই জরুরি প্রয়োজন। একই সাথে সার্বিকভাবে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সংগ্রামের ধারায় ঐক্য সংহতি গড়ে তোলা, দোদুল্যমান আপসকামী নেতৃত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করাও আশু কর্তব্য।

এই ধর্মঘটকে বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যম কেবল 'মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন' হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করেছে। এর দ্বারা এই আন্দোলনের সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের যোগ নেই — এটা দেখানোর অপচেষ্টা হয়েছে। যে রেলকে বলা হয় জাতীয় জীবনের ধমনী, অর্থাৎ যে রেল জাতীয় জীবনের প্রবাহ বজায় রাখে সেই রেলের কর্মীদের সমস্যা সমাজের সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। রেল কর্মচারীদের একথা বুঝতে হবে তাঁদের সমস্যা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন সমস্যা নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমনীতির সঙ্গে ও সেই অর্থে সকল কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীর সমস্যার সাথে তাঁদের সমস্যা জড়িত। আবার রেলের মতো জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত থাকায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তাঁদের দায়িত্বও বেশি। সকল অংশের কর্মচারী সহ সাধারণ মানুষের জীবনে যে সমস্যাগুলি দেখা দিয়েছে তার মূল নিহিত রয়েছে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার গভীরে, যার উচ্ছেদ সাধনের সংগ্রামে সকল অংশের শোষিত মানুষ অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা উচ্ছেদের পরিপূরক কোন আন্দোলন সাধারণ মানুষ গড়ে তুললে তার পাশে শ্রমিক কর্মচারীদের যেমন দাঁড়াতে হবে তেমনি কর্মচারীদের আন্দোলনের পাশে সাধারণ মানুষকেও দাঁড়াতে হবে। তা না হলে কোন অংশের মানুষের আন্দোলন ব্যাপক সুদৃঢ় জনভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারে না। আর দৃঢ় গণভিত্তির উপর আন্দোলনকে দাঁড় করাতে না পারলে বুর্জোয়া অপপ্রচারের পর্দা ছিঁড়ে দিয়ে এবং আক্রমণ মোকাবিলা করে আন্দোলনকে দীর্ঘস্থায়ী করাও সম্ভব নয়।

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা আবারও আন্দোলনে ফেটে পড়বেন। বঞ্চনা তাঁরা মুখ বুজে চিরকাল সইবেন না। নেতৃত্বের আপসমুখীনতাকে চিনে নিয়ে যোগ্য নেতৃত্বের সন্ধানও তাঁরা করবেন। বর্তমান থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামী দিনে আন্দোলনকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে স্তরে স্তরে গড়ে তোলা দরকার আন্দোলনের গণকমিটি। এই কমিটি নেতৃত্বের হঠকারিতা, আপসমুখীনতা প্রতিহত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে পারে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩২৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in